আশ্চর্য্য ভ্রমণ কাহিনী

(পরিব্রাজকের উক্তি)

"হরিদ্বার হইতে কেদার ও ৺বদরী-নারায়ণ
যাইবার পথ।"

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

আশ্চর্য্য ভ্রমণ কাহিনী

(পরিব্রাজকের উক্তি)

"হরিদ্বার হইতে কেদার ও ৺বদরী-নারায়ণ
যাইবার পথ।"

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

প্রকাশক—
গ্রন্থকার
১৩।২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

কৌমুদী প্রেস
শ্রীচণ্ডীচরণ গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত,

মুখবন্ধ।

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই বিশেষ ব্যস্ততা বশতঃ এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য হওয়ায় মুদ্রা দোষ হওয়া সম্ভব। অতএব সহৃদয় পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভ্রম সকল গ্রন্থকারকে অবগত করাইলে বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি—

বিনীত

গ্রন্থকার।

ভুমিকা।

—০—

অনেক পুণ্যশীল মহাত্মা ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি হরিদ্বার হইতে হইতে কেদার ও বদরিকাশ্রম যাতায়াতের পথ সবিশেষ অবগত না থাকায়, ইঁহাদের এবং অন্যান্য তীর্থযাত্রীগণের বদরীনারায়ণ দর্শনের ইচ্ছা থাকিলেও, ভীষণ হিংস্রজন্তু পরিপুরিত দুর্গম গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া বদরিকাশ্রম যাইতে সাহস করেন না; সুতরাং তাহাদের মনের আশা মনেই থাকিয়া যায়। ইহাদের সুবিধার জন্যই আমার এই অকিঞ্চিৎকর ভ্রমণ-কাহিনী লিখিলাম। হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম যাইতে হইলে কি কি বিশ্রাম স্থান ও তীর্থাদি আছে, তাহাদের নাম চটী এবং দূরত্ব ও বিপদ পূর্ণ স্থান সমুহের বিশেষ বিবরণ সকল এই ভ্রমণ-কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাতে একটী মাত্র তীর্থ যাত্রীর উপকার সাধিত হইলেও পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

কলিকাতা
১লা বৈশাখ সন ১৩২৫ সাল।

পরিব্রাজক

পরিব্রাজকের ভ্রমণ-কাহিনী।

ভূমিকা

প্রলাপে

শৈশবের কথা তত মনে হয় না, কি যেন অস্ফুট স্বপনের মত প্রহেলিকাময় মহা ঘুমের নেশা সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাই—"জীবন-রহস্য" জানিতে ও বুঝিতে চাহিলেও বুঝি জগতে ইহা জানাইবার এবং বুঝাইবার লোকসংখ্যা অতি বিরল, তাই চেষ্টা করিয়াও জানিতে ও বুঝিতে পারি নাই। পরিশেষে নিরাশায় কাতর হইয়া ব্যাকুলিত প্রাণে একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। আঃ! মরি মরি, কি দেখিলাম! অতৃপ্ত নয়নে কেবলি দেখিতে লাগিলাম। নক্ষত্র খচিত সুনীল গগনে শরতের পূর্ণচন্দ্র যেন যৌবনের মনোহর সৌন্দর্য্য লইয়া আমার পানে চাহিয়া

সুমধুর হাস্য করিয়া যেন ঢলিয়া পড়িতেছে, তা এত হাসি কেন? তাহার নির্ম্মল জ্যোৎস্নারাশি জগতমণ্ডলকে বিধৌত করিয়া নিজে হাসিয়া সকলকেই হাসাইতেছে? তাই বুঝি এ অফুরন্ত হাসি আর থামে না। আঃ! মরি মরি, কেবলি ঐ মধুর হাসি; জগতে শোক, তাপ, আশা-নিরাশা, দৈন্য, হাহাকার আছে বটে, কিন্তু একি! বিষাদ-নিরানন্দ সকলি পলায়ন করিয়াছে, এখন আছে শুধু আনন্দ আর হাসি। আমার কথা মিথ্যা নয়, ওগো কে আছ, তোমরা ঐ আকাশের পানে একবার চাহিয়া দেখ, সত্য সত্যই চাঁদ কেমন হাসিতেছে? একবার ভাল করে চাহিয়া দেখ!—সচ্চিদানন্দ জগদানন্দের সেই আনন্দ-কিরণরাশি যেন "চন্দ্রমণ্ডলে" প্রতিফলিত হইয়া অপক্ষপাতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে রাজ্যেশ্বরের সুরম্য রাজ-প্রাসাদ পর্য্যন্ত সমভাবেই বিতরিত হইতেছে। এখানে ভেদ নাই, পক্ষপাতিত্ব নাই, এ সাম্যের রাজ্যে বৈষম্য নাই, তাই বুঝি চাঁদ আজ এত সুন্দর এত মনোহর ও মধুর, সকলের প্রিয় ও নয়নানন্দকর। এ শান্তির রাজ্যে অশান্তির ছায়া নাই, কেননা যে এমনভাবে আপনা ভুলিয়া আপনাকে বিলাইয়া সকলকে ভালবাসিতে পারে, কেনা তাহাকে ভাল বাসিয়া থাকে? তাই বুঝি চাঁদকে সকলেই ভাল বাসে। প্রশ্নের উত্তর পাইলাম।

এই ভালবাসার অভাবেই মানুষ নিরানন্দ সাগরে ডুবিয়া মরে, দুঃখের বোঝা বহিয়া, হিংসা বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, মনের অশান্তিতে জীবনের অমূল্য-রত্ন সুখ ও শান্তি হারাইয়া অনর্থক দিবানিশি যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইয়া থাকে। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সংসারের দিকে চাহিলাম।

ইহার আপাততঃ বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম বটে, কিন্তু মনে মনে জানিলাম পরিণামে এ সমস্তই বৃথা! এখানে সুখশান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। মনের ভিতর তীব্র দাবানল জ্বলিয়া যেন হৃদয়কানন মরুভূমির মত ছারখার করিয়া দিল।

অতি শৈশব কালেই পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। কিন্তু তাহার স্মৃতিটুকু যেন তুষানলের মত স্ফুলিঙ্গাকারে হৃদয় মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলিয়া ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল, কি দারুণ যন্ত্রণা! তাহাতে আবার সংসার মরুর মাতৃস্নেহরূপ বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়াটুকু যাহা দীন দরিদ্রের রত্নের মত একান্ত সম্বল ছিল, সেটুকুও আবার নিষ্ঠুর কাল এই সময়ে তাহার নির্ম্মম মৃত্যুরূপ কুঠারঘাতে ঐ ছায়াবৃক্ষের মূলদেশ পর্য্যন্ত ছিন্ন করিয়া দিল। সুতরাং রুদ্রমূর্ত্তি মার্ত্তণ্ডের প্রখর সুতীক্ষ্ণ রশ্মি জাল নির্ম্মম ভাবে দিবারাত্র সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতে লাগিল।

মা—মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কত কান্দিলাম—ডাকিলাম —কে সাড়া দিবে? দূরান্তরে যেন অস্ফুট স্বরে প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গভাবে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, হায়! সেই অরণ্যে রোদন আর কে শুনিতে আসিবে? শুনিবার লোক আর নাই—যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা ত অরুণোদয়ে নক্ষত্রের মত সকলেই একে একে অস্ত গিয়াছেন। তাঁহারা ত মায়াময় সংসার প্রপঞ্চের নশ্বরতার ভীষণ চিহ্ন-স্বরূপ জ্বলন্ত শ্মশান বহ্নিতে চোখের সাম্‌নে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেলেন, আর কাঁদিলে কি হইবে? হরি হরি সবই গেল বটে, কিন্তু স্মৃতিটুকুই শুধু মধ্যে মধ্যে দংশন করিয়া হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল।

এখন আর উপায় কি? এ অকূল পাথারে আর কোন উপায় নাই। ভগবান কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না, একবার যুক্তকরে শূন্য মনে ঊর্দ্ধদিকে চাহিলাম মাত্র! কিন্তু সবই যেন গাঢ় অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

তারপর সংসারে যাহাদিগকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া মনে ভাবিয়াছিলাম, বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কি আশ্চর্য্য তাহাদের মাভৈঃ রব অর্থাৎ সান্ত্বনাবাণী সকল যেন দৈববাণীর মত একে একে সহসা শূন্যে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। কি ভীষণ প্রতারণা! "আকাশ-কুসুম" মত বৃথা কল্পনায়

সম্মোহন বাক্যে ভুলাইয়া অবশেষে তাঁহারা সুযোগ বুঝিয়া দগ্ধ ক্ষতে আরও অধিক করিয়া লবণ প্রদান করিলেন।

এ মর্ম্মান্তিক যাতনা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। সংসারী আত্মীয়গণের স্নেহবাক্যগুলি কলসীর মুখের ক্ষীরের মত মনোরম বটে কিন্তু ভিতরের গুপ্ত বিষের বিষম জ্বালা!

এক একটী বাক্যবাণ যেন বিষাক্ত শেলের মত অন্তরমধ্যে বিঁধিয়া তীব্র যাতনার উদয় হইত, তাহার মর্ম্মান্তিক যাতণায় অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করিতাম। বাহিরে শুনাইবার আবশ্যক কি? ভিতর হইতে যদি কেহ শুনেন তবেই সার্থক! তাই হৃদয়ের এই দারুণ সন্তাপে বাহিরের অশ্রুজল মুছিয়া যাইত। বাক্য দ্বার রুদ্ধ হইল। অভাব আর কাহাকেও জানাইলাম না। সংসাররূপ বৃক্ষের মহা ঝড় দিবারাত্র মস্তকের উপর দিয়া চলিল, সমস্তই নীরবে সহ্য করিলাম। এ সময়ে হাতে অর্থ নাই, সাহায্য করিবার লোকও নাই, কিন্তু উপরে ত একজন আছেন।

মানুষের সাহায্য লইয়া কি হইবে? যাহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ আছে, যাহাদিগকে মানুষ ভাবিয়া ও আশ্রয় বৃক্ষ বলিয়া নির্ভর করিয়াছিলাম, হরি হরি! তাহারা কি মানুষ! মনুষ্যের হৃদয় কি কখন এমন নির্দ্দয় পাষাণ হয়?

এ দেখি যে সব মুখোস পরা মানুষের মত কেহ ব্যাঘ্র, কেহ ভল্লুক, কেহ সর্পের মত বন্য সিংস্র জন্তু সব আরক্ত লোচনে যেন আমাকে গ্রাস করিবার জন্য লোলুপ দৃষ্টিতে বদন ব্যাদান করিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে। এত স্নেহ নয়! অন্তর দৃষ্টিতে দেখি যেন তাহাদের সজল জিহ্বা সকল লক্ লক্ করিয়া স্নেহের ভানে লোলুপ দৃষ্টিতে আমা পানে চাহিয়া আছে।

এর চেয়ে চিড়িয়াখানা যে শতগুণে ভাল, কারণ তাহারা যে আবদ্ধ তাহাদের স্বাধীনতা নাই। ব্যাঘ্র ইচ্ছা করিলেই রক্ত চুষিতে পারে না। সর্প ইচ্ছা করিলেই বিষ দন্তে বিষ ঢালিতে পারে না।

বেড়া জালের মত চতুর্দ্দিকে ভীষণ শোকের ও বিষাদের ছায়া অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারের মত ছাইয়া ফেলিল, যেন আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত! এই সময় আবার দারুণ আকস্মিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, আমার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্রটী অগ্নিদগ্ধ হওয়ায়, ঝড়ে বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায়, অকালেই সংসার বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িল, তাহার সেই শোচনীয় মৃত্যু যন্ত্রনা দেখিয়া, এবং পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর আকস্মিক পরলোক গমনে কি যেন এক বিষাক্ত বাণ হৃদয়ের মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া শতধাছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল, তাহার

বিষের জ্বালায় যেন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। এ ঘোর সঙ্কটে সান্ত্বনাবাণী প্রদান করে এমন লোক নাই।

ভাবিলাম সংসারের সকলবন্ধন যখন একে একে খসিতেছে তখন আর কেন? এইবার ছুটিয়া পালাইয়া কোথায় যাই? সংসারে এমন কে আত্মীয় আছেন যে এই বিপদের সময় আশ্রয় প্রদান করে? কোন খানে গেলে এ প্রাণের জ্বালা জুড়ায়?

আর একবার ভগবানের নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলাম, তিনি শুনিলেন কিনা বুঝিলাম না, কিন্তু ছুটিলাম।

আর পশ্চাত পানে চাহিলাম না, ডাকিলাম ওহে দয়াময়! অসময়ের বন্ধু যদি কেহ থাক তবে এইবার সদয় হও, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। কপর্দ্দকশূন্য হইয়া একবস্ত্রে একাকী কোথায় চলিলাম, তাহাও বুঝিনা—ভাল, মন্দ কিছু জানিনা—তুমি সকল জান—রক্ষা করিও প্রভু! কাঙ্গালের তুমি ভিন্ন আর বন্ধু কে আছে হরি! অসময়ে দয়া করিও। এইরূপে অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া তীরবৎ ছুটিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

অকুল পাথার

নদী তীরে যাইয়া দেখি একখানি নৌকা যাইতেছে, তাহাতে একটী পরিচিত লোক বসিয়া রহিয়াছেন। নৌকা তীরের নিকট দিয়াই যাইতেছিল সুতরাং অমনি আমি শ্রীদুর্গা বলিয়া লম্ফ দিয়া নৌকায় উঠিলাম।

আমার সেই উন্মাদের মত বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া, সেই পরিচিত লোকটী আমার প্রতি সবিস্ময়ে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন একি! আপনি এবেশে কোথায় যাইতেছেন?

আমি একটু থত মত খাইলাম, যথা সাধ্য সংযত হইয়া মনের ভাব চাপিয়া গেলাম। কৌশলে বলিলাম, আমি কোন কার্য্য বশতঃ যাইতেছি, অতি নিকটেই নৌকা হইতে অবতরণ করিব। ব্যস্ততা বশতঃ আসিয়াছি এইরূপ নানা কথায় ও গল্পে তাহাকে ভুলাইয়া অনেকদূর গেলাম। তারপর নির্দ্দিষ্ট স্থানে নামিয়া একটী দোকানে গিয়া অভুক্ত অবস্থায়ই সেখানে সে রাত্রি যাপন করিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া হস্তমুখ ধৌত করিয়া ক্রমান্বয়ে দশক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়া অপরাহ্নে একটী

আত্মীয়ের বাসায় আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিলাম। এখান হইতে প্রায় একক্রোশ দূরেই রেল ষ্টেশন আছে।

সমস্ত রাত্রি নানা দুর্ভাবনায় আমার নিদ্রা হইল না মাঝে মাঝে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। দৈবের কি বিচিত্র কাণ্ড! রাত্রিতে হঠাৎ দেখি রুমালের ভিতর আমার সহধর্ম্মিণীর একছড়া সোণার মালা রহিয়াছে।

ভোরে যেন একটু নিদ্রা হইল। যখন উঠিলাম তখন দেখি সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ উদয় হইয়াছেন। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া এক স্বর্ণকার দোকানে গিয়া ঐ মালা বিক্রয় পূর্ব্বক কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলাম। তারপর অতি দ্রুতপদে রেল ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যথা-সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া সত্বর একখানি কলিকাতার টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। ক্ষুধা পেলে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। ক্রমে ঘণ্টা বাজিল, বংশীধ্বনি করিয়া গাড়ী হুপ্ হাপ্ শব্দে ধূম উদ্গীরণ করিয়া কলিকাতা-ভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। যথাসময়ে, ট্রেণ আসিয়া শিয়ালদহ পৌঁছিল। আমি এখান হইতে বরাবর পদব্রজে হাওড়া ষ্টেশনে গমন করিয়া হরিদ্বারের একখানা টিকিট করিয়া যাইয়া উঠিলাম। যথাসময়ে ট্রেণখানি প্লাটফরম ত্যাগ করিল।

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমি হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই, যে এত বড় সুদীর্ঘ ভ্রমণ আমার অদৃষ্টে লেখা আছে। পূর্ব্বে এক বিখ্যাত জ্যোতিষী আমার হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, উত্তরে আমার একটী বহুদূর ভ্রমণ আছে, কিন্তু কোথায় তাহা ঠিক বলিতে পারেন নাই ; এজন্য আমি তত বিশ্বাসও করি নাই এখন দেখি তাহা বাস্তবিকই সত্যে পরিণত হইতে চলিল। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীখানি কিছুক্ষণ দেরী করিল। আমার ক্ষুধায় যেন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল এই অবসরে আমি ট্রেণ হইতে নামিয়া একটী হোটেলে প্রবেশ করিলাম।

হোটেলওয়ালা অতি যত্ন সহকারে আমার আহারের আয়োজন করিয়া দিল, পেটের ভিতর যেন অগ্নিদেব প্রবল বেগে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিলেন সুতরাং আমি বিনা বাক্যব্যয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক থালা অন্ন নিঃশেষ করিয়া ফেলিলাম। পুনরায় ভাত চাহিবামাত্র কে যেন বলিয়া উঠিল, বাবু! আর বিলম্ব করিবেন না এখনি ট্রেণ ছাড়িয়া দিবে। আমি বলিলাম, তা হোক্ এট্রেণে যাইতে না পারি পরের ট্রেণে যাইব, আমার ব্যস্ততার কোন কারণ নাই, আরও ভাত, ডাল, তরকারী দাও এই কথা শুনিবামাত্র

হোটেলওয়ালার মুখখানি সহসা অমাবস্যার মেঘের মত অন্ধকার হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া আমি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

অনেক সময়ে নিরীহ ভদ্রলোকদিগকে ঠকাইবার জন্য হোটেলওয়ালারা ঐ গাড়ী ছাড়িল বলিয়া প্রতারণা করিয়া থাকে ইহা জানিতাম, সুতরাং আমি আকণ্ঠ ভোজন করিয়াই উঠিলাম। হোটেলের দেনা চুকাইয়া অবিলম্বে ষ্টেশনে যাইয়া দেখি তখনও গাড়ী ছাড়িতে ১০ দশ মিনিট বিলম্ব আছে আমি ট্রেণে উঠিলাম, কিছুক্ষণ পরে টং টং করিয়া ঘণ্টা বাজিল, গাড়ীখানি বংশীধ্বনি করিতে করিতে ঝড় বেগে গয়াভিমুখে ছুটিল।

গয়া ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে সেখানে যাইয়া গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম, এখানে অক্ষয়-বটমূলে, ফল্গু নদীতে এবং গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করিতে হয়, এই সমস্ত কার্য্যে এখানে সম্পন্ন করিয়া পুনরায় ট্রেণে উঠিলাম।

অল্প রাত্রি থাকিতে, ই, আই, রেলওয়ের মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া অবতরণ করিলাম। এইখানে অযোধ্যা লাইনে গাড়ী বদল করিতে হয়, সুতরাং এই স্থানে আউধ রোহিলখণ্ডের রেলওয়েতে উঠিলাম, তখন প্রায় ভোর হইয়াছে

ইত্যোমধ্যে আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে গাড়ী-খানি দ্রুতবেগে সশব্দে বাণারসী রাজঘাটের পুলের উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা গঙ্গা মায়ী কি জয়! হর হর! বম্ বম্! জয় বিশ্বনাথ কি জয় ইত্যাদি শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গাড়ীর জানালার পার্শ্ব দিয়া দেখি, মুক্তি-ক্ষেত্র পুণ্যভূমি কাশীর কি চমৎকার অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য! সকলেই এমন ভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছে, যে, দেখিলে নিতান্ত নীরস প্রাণেও অপূর্ব্ব ভক্তি-ভাবের সঞ্চার হয়। আমিও ভক্তিভরে ৺ বাবা বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম, এবং জীবনকে ধন্য ও পবিত্র মনে করিলাম। এখানে গঙ্গা অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বাঁকিয়া গিয়াছে। উত্তরে বরুণা নদী এবং দক্ষিণে অসি, এই ক্ষুদ্র নদীদ্বয়ের মধ্যভাগে কাশীধাম অবস্থিত, কি মনোহর শোভা! যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল সারি সারি অসংখ্য মন্দির সকল সুন্দর পুষ্প মাল্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অগণিত সোপাণশ্রেণী একটীর পর একটী করিয়া যেন স্বর্গে উঠিয়াছে।

গঙ্গার ঘাটে কত শত নৌকা, বোট, পান্সী, নদী তরঙ্গে চলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে। নহবৎ হইতে মধুর স্বরে প্রভাতি বাদ্য বাজিতেছে, তাহার সকরুণস্বরে এবং উষাকালীন সূর্য্যোদয়ে সকলের মন-প্রাণে কি এক অনির্ব্বচনীয়

আনন্দের উদয় হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বর্ণনা করা অসাধ্য। এমন পবিত্র তীর্থ স্থান, তাহে আবার পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর সুশীতল জলে কত ভক্তপ্রাণ সহস্র সহস্র নর-নারীসকল ও আবাল বৃদ্ধবনিতাগণ অবগাহন করিয়া, সংসারের শোক, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা সকল মুহূর্ত্ত মধ্যে ভুলিয়া যাইতেছেন। কতশত ভক্ত গললগ্নীকৃতবাস হইয়া গঙ্গামাহাত্ম্য স্তব করিতেছেন। মনে হইল সত্য সত্যই যেন স্বর্গধামে ইন্দ্রালয়ে গমন করিতেছি।

কাশীর ষ্টেশনে নামিয়া এক আত্মীয়ের বাসায় থাকিলাম। এখানে ৺ বাবা বিশ্বেশ্বর এবং মাতা অন্নপূর্ণার আরতি অতি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা অতি চমৎকার দৃশ্য! যখন সহস্র সহস্র নর-নারী অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া আরতি দর্শন করেন, তখন মনে হয় যেন সাক্ষাৎ ভক্তিদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া সকলকে দেখা দিয়া থাকেন।

বেণীমাধবের ধ্বজা অতি উচ্চ, ইহার উপরে উঠিলে পঞ্চক্রোশী কাশীর দর্শন হইয়া থাকে। ইহার পর এখানে কত দেবালয় ও মন্দির আছে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। প্রথমে চক্রতীর্থে স্নান করিয়া কাল ভৈরবের বাটী তারপর বেণীমাধব এবং ৺ত্রৈলঙ্গ স্বামিজীর প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, শেষে আনন্দবাগে ভাস্করানন্দ স্বামিজীর মূর্ত্তি দর্শন

করিয়া মানস সরোবর, পরে দুর্গা বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম, এখানে অসংখ্য ছোট বড় বানর দলে দলে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, ইহার সাম্‌নে একটী প্রকাণ্ড কুণ্ড, এই কুণ্ডের জল অতি পবিত্র বলিয়া তাহা ভক্তিভরে মস্তকে স্পর্শ করিলাম।

আনন্দ-কানন কাশীর কি মনোহর শোভা। এ স্থান অতুলনীয় ও অতি পবিত্র। প্রাচীনকালের কত ইতিহাস ইহার অঙ্গে জড়িত হইয়া আজও সাক্ষ্যস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে যে, বাহুল্য ভয়ে তাহা বলা অনাবশ্যক। গঙ্গার নিকটে এক বৃহৎ "মানমন্দির" অবস্থিত আছে, প্রাচীনকালে জ্যোতির্ব্বিদগণ এখানে গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গণনা করিতেন। এখনও এখানে একটী প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ যন্ত্র রহিয়াছে দেখিলাম। শাস্ত্রে লেখা আছে পৃথিবীতে যত তীর্থ স্থান সমুদয়ই এখানে বর্ত্তমান আছে। এখানে জগন্নাথ কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, গুপ্ত বৃন্দাবন, আদিনাথ, প্রয়াগাদি এক প্রকার সমস্ত তীর্থই বিদ্যমান। এইজন্য কাশীবাসীরা তিথি বিশেষে যাত্রা করিয়া একে একে সমুদয় স্থানগুলি দর্শন করেন।

হরিশ্চন্দ্র নামে আর একটী ঘাট আছে। এখানেও শবদাহ করা হয়। কলিকাতার নিমতলার মত এখানে

মনিকর্ণিকার ঘাটে মহাশ্মশান দিবারাত্র জ্বলিতেছে। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলে, এই স্থানেই মহারাজা হরিশ্চন্দ্র এবং রাণী শৈব্যার মিলন হয়। এখানে মৃত্যু হইলে নাকি মৃত্যুকালে মহাদেব জীবের দক্ষিণ কর্ণে তারকমন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন, সেজন্য এই মুক্তি ক্ষেত্রে অনেকে বৃদ্ধ বয়সে আসিয়া বাস করেন।

মহাত্মা তুলসী দাস যে স্থানে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন সেই স্থান দর্শন করিয়া, গঙ্গার ওপারে ব্যাসকাশী রামনগরে রাজার বাটী ইত্যাদি দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

এ স্থানে মা অন্নপূর্ণার কৃপায় কেহই উপবাসী থাকে না। পশ্চিম দেশীয় এবং এ দেশীয় কত রাজা, মহারাজা এখানে অসংখ্য ছত্র দিয়া অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিশেষতঃ কলিকালে অন্নদান মহাপুণ্য সন্দেহ নাই। তাই এ কাশীধামে অন্নপূর্ণার রাজত্বে দরিদ্র, কাঙ্গাল, ভিখারী কেহই উপবাসী থাকে না। ইহার পর জ্ঞানবাপী দেখিতে গেলাম, এখানে একটী প্রকাণ্ড গহ্বরমধ্যে একটী শিবলিঙ্গ আছেন, উহাকেই জ্ঞানবাপী বলে। ইহার জলপান করিলে নাকি দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়।

এইখানেই লুকাইয়া আছেন। উপর হইতে অনেক যাত্রী কর্পূর জ্বালাইয়া এই গহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহারই উজ্জ্বল আলোকে শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এ স্থানে অসংখ্য শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে, দেখিলে মনে হয় যেন বিরাট শিবের মেলা বসিয়াছে। এখানকার প্রধান প্রধান স্থান সকল দর্শন করিয়া পুনরায়বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনে গিয়া ট্রেণে উঠিলাম। তারপর ট্রেণখানি যাইতে যাইতে অযোধ্যা ষ্টেসনে থামিলে আমি পুনরায় এখানে নামিয়া পড়িলাম। এখানে যে হঠাৎ অযোধ্যায় পড়িবে, ইহা আমার পূর্ব্বে জানা ছিল না এক্ষণে ষ্টেসনে হঠাৎ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি প্লাটফরমে লেখা রহিয়াছে "অযোধ্যা" আমি তখনই নামিয়া পড়িলাম। ট্রেনখানি একটু পরেই ছাড়িয়া দিল। আমি অনেক দূরের টিকিট কিনিয়াছিলাম বলিয়াই মধ্যে মধ্যে দুই এক স্থানে বিশ্রাম করিয়া যাইতে পারিয়াছিলাম। দূর হইতে "রামসীতার" মন্দিরের স্বর্ণ চূড়া দৃষ্ট হইতে লাগিল, আমার সঙ্গে একটী বলিষ্ঠ স্থূলকায় পাঞ্জাবী আসিতেছিল, আমরা উভয়েই ভক্তিভরে মন্দির পানে নমস্কার করিলাম। পরিশেষে ধীরে ধীরে সহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ষ্টেসন হইতে সহর অতি নিকটে পথিমধ্যে আমাদিগকে এক পাণ্ডা আসিয়া গ্রেপ্তার করিল।

কাজে কাজেই সঙ্গী পাঞ্জাবীটির অন্যত্র গমন ইচ্ছা থাকিলেও বাধ্য হইয়া এই পাণ্ডার গৃহে গমন করিলেন। ঘরে অসংখ্য যাত্রীর ভিড় দেখিয়া আমরা উভয়ে দ্বিতল অট্টালিকার ছাতের উপর থাকিলাম। সন্ধ্যাকালে ৺রামসীতার আরতি হইতে লাগিল। শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরাদির শব্দে যেন অযোধ্যা প্লাবিত হইয়া গেল। আমরা নিকটস্থ মিঠাইএর দোকান হইতে কিছু কচুরী ও হালুয়া কিনিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ পূর্ব্বক ছাতে শুইয়া নিদ্রা গেলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সরযূ নদীতে স্নান করিতে গেলাম। অতি প্রকাণ্ড নদী, ভয়ঙ্কর ঢেউ দেখিয়া সাঁতার কাটিতে ইচ্ছা হইল না। এখান হইতে অনতিদূরে অযোধ্যার প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি অতি চমৎকার দেখা যায়, হায়! কোথা সেই রাম, কোথা লক্ষ্মণ, কোথা ভরত, কোথাই বা শত্রুঘ্ন, আর কোথাই বা রাজা দশরথ, এখন ইঁহাদের বিহনে যেন অযোধ্যাপুরী শূন্য বলিয়া মনে হইল, এখানে স্নান করিলে মহাতৃপ্তি এবং শান্তি বোধ হইয়া থাকে; জলের এ অতি আশ্চর্য্য গুণ! নদীর উপকূলে বসিয়া বালি দ্বারা পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া পিতা মাতার উদ্দেশ্যে প্রদান করিলাম এবং পবিত্র জলে নামিয়া তর্পণাদি শেষ করিলাম। তারপর পাণ্ডা ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া বিখ্যাত হনুমানজীর মন্দির অভিমুখে গমন করিলাম, এ মন্দির একটু উচ্চে

অবস্থিত, অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া তবে উপরে উঠিতে হয়। এখানে মহাভক্ত হনুমানের মূর্ত্তি পূজা হইয়া থাকে তাই যে কেহ রামভক্ত, সেই এ ভক্তের মূর্ত্তি পবিত্র মনে দর্শন করিয়া থাকেন। এখন হইতে রামসীতার মন্দির, দশরথ রাজার বাড়ী, রাজধানী ইত্যাদি নানাবিধ দর্শনীয় স্থান দেখিয়া অপরাহ্নে ট্রেণে উঠিয়া পুনরায় হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মধ্যে একটী ষ্টেসনে গাড়ী বদলাইতে হইয়াছিল। পরে যথা সময়ে হরিদ্বার ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিলাম। তখন সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া ছিলেন একটু পরেই অস্তমিত হইলেন। পথে একাকী যাইতে যাইতে একটী হিন্দুস্থানীদলের সঙ্গে মিশিলাম, বিদেশে একাকী থাকিতে সাহস হইল না। এই দলে একটী পণ্ডিত আছেন, এবং সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দশ পনের জন লোক হইবে। সকলেই হিন্দী কহে, আমি বাঙ্গালী হইলেও অগত্যা নিরুপায় হইয়া ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। এখানে বাঙ্গালী খুব অল্প, তাও পরিচয় নাই। পথে একটী পাণ্ডা আমাদিগকে দখল করিয়া বসিল। আমরা বড় একটী রাস্তা দিয়া ধীরে ধীরে পদব্রজে সহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। হরিদ্বার বেশ সহরের মত দেখিতে, আমাদের দলে একটী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীকে দেখিলাম, তাহার সঙ্গে ব্যাঘ্রচর্ম্ম আর একটী চিম্‌টা ও কমণ্ডলু রহিয়াছে। ইনি ভস্ম

খাবেন না, "মৌনাবলম্বী সাধু", কোন কথাই কহেন না। ইহাকে দলের সকলেই বিশেষ ভক্তি করে, সকলেই সাধু বাবা সাধু বাবা বলিতেই অজ্ঞান।

আমরা সকলে একত্রিত হইয়া হরিদ্বারে গঙ্গার পারে এক সুবৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকার উপরে পাণ্ডার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সন্ধ্যার একটু পরে আমরা সকলে হরিদ্বারের গঙ্গার দৃশ্য দেখিতে বাহির হইলাম।

সন্ধ্যাকালে গঙ্গাদেবীর আরতি দর্শন একটী অপূর্ব্ব জিনিষ, কি পবিত্র, কি সুন্দর দৃশ্য! তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝান যায় না, হেমরজতনির্ম্মিত দীপাধারে পাণ্ডাগণ যখন আরতি করেন তখন সমবেত ভক্তমণ্ডলী জয় গঙ্গামায়ীকি জয় বলিয়া অনবরত চীৎকার করিয়া থাকেন—শঙ্খ, ঘণ্টানিনাদে যেন সমস্ত সহরটী আলোড়িত হইতে থাকে এখানে কাক-চক্ষুর মত গঙ্গার জল অতি নির্ম্মল, খরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার মধ্যে ভক্ত প্রদত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র দীপ সকল নক্ষত্রের মত সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

কত সাধু সন্ন্যাসী জলের উপরিভাগে প্রস্তর খণ্ডোপরি ধ্যান নিমিলীতচক্ষে বসিয়া আছেন; তাহাদের চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিতেছে সাধুরা বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া একমনে সেই ভগবানের ধ্যান করিতেছেন সে দৃশ্য কি সুন্দর!

ছোট ছোট কাঠের উপর ভাসিয়া এই খরস্রোতা জলের উপর অনেকে সন্তরণক্রীড়া করিতেছে তাহাতে যেন কত আনন্দ! বাস্তবিক এই গঙ্গাজলে স্নান করিয়া এবং সাঁতার কাটিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিলাম। জলের কি স্বাদ "জল পেট ভরিয়া—আকণ্ঠ খাইলেও পুনরায় খাইতে ইচ্ছা হয়।

এখন স্বাদু স্নিগ্ধ পবিত্র গঙ্গাজল পান করিয়া জঠরানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। সুতরাং নিকটস্থ বাজারে যাইয়া কিছু হালুয়া ও পুরী আনিয়া জলযোগ করিয়া পাণ্ডার গৃহে শুইয়া রহিলাম, সঙ্গীযাত্রীরা এবং সাধুটীও রহিলেন।

এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অতি অল্প শুধু হিন্দুস্থানী, মাদ্রাজী, সিন্ধিয়া, গুজরাটী, মাড়োয়ারীর সংখ্যাই অধিক বিশেষতঃ এই দূর দেশে প্রবাসে আত্মীয় এবং পরিচিত ব্যক্তি কেহ নাই, সুতরাং বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম, কোথা যাই, কি করি? হাতের যাহা কিছু অর্থ সম্বল ছিল, তাহা সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে। এই নিঃসম্বল অবস্থায় একাকী হরিদ্বারে, এই পাণ্ডার ত্রিতল অট্টালিকার উপর শুইয়া একাকী চিন্তা করিতে লাগিলাম। পাশের হলে অন্য কামরায় যাত্রীর দল ঘুমাইতেছিল। ইহার পর হইতেই আমার কষ্টকর ভ্রমণ বৃত্তান্ত আরম্ভ [illegible]

এই ভাবেই কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন, চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা, প্রয়াগ, শ্রীক্ষেত্র, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, নবদ্বীপ, তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ এবং বিন্ধ্যাচল ভ্রমণ করিয়াছি তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

বস্তুতঃ এই সময়ে আমার কিছুমাত্র প্রাণের মায়া বা ভয় ছিল না ; অনাহারে প্রাণ যায় সেও ভাল, বনের ভীষণ হিংস্রজন্তু সকলে গ্রাস করে, তাহাতেও আপত্তি নাই, ভগবানকে স্মরণ করিয়া প্রতিপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এইভাবে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পবিত্র তীর্থ স্থানগুলি একে একে দর্শন করিয়া হৃদয়ের গুরুভার যেন কতকটা লাঘব হইল।

বাস্তবিক প্রকৃতির রমণীয়া আশ্চর্য্যশোভা সন্দর্শন করিলে সংসারের শোক, তাপ, জ্বালা যন্ত্রণাদি কিছুই মনে থাকে না।

নূতন নূতন দৃশ্য সকল দেখিয়া হৃদয়ে যুগপৎ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়।

উত্তাল তরঙ্গমালা, ভীষণ সমুদ্র, অভ্রভেদী ধবলগিরি, পার্ব্বতীয় নদী ও ঝরণাদির মোহন দৃশ্য সকল এবং প্রকৃতির মনোহর উদ্যান দেখিলে মনে হয়, যেন কোন অজানিত স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি, অপার্থিব বস্তু সকল স্তরে স্তরে

তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডারে কতই না সজ্জিত আছে, তাহা বলা অসাধ্য। পুত্র কাঁদিলে মাতা যেমন সন্তানের আনন্দ উৎপাদনের জন্য ক্রীড়া পুত্তলিকা দ্বারা তাহাকে ভুলাইয়া থাকেন, তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে সন্তানের নিরানন্দ ভাব চলিয়া যায় জগন্মাতা প্রকৃতিদেবীও সেই প্রকার সংসার তাপদগ্ধ সন্তানের জন্য তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডারে অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন যে তাহা দর্শন করিলে, নিমেষ মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া মানব প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য লীলা মা তোমার, একদিকে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে তুমি পুত্রকে তাড়না করিতেছ, অন্য দিকে আনন্দময়ী বেশে আবার সেই ছেলেকেই ক্রোড়দেশে স্থাপন পূর্ব্বক আদরে মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে শান্ত করিতেছ। তাই কবি কহে ভক্তিভরে, "অসম্ভব যত তোমাতে সম্ভবে," মা! অনন্তরূপিনী তুমি অনন্ত ভাবেতে আছ ব্যক্ত চরাচরে সামান্য মানব কেমনে বুঝিবে তোমা? হে জননী! কৃপা করি তুমি জ্ঞান চক্ষুঃ না করিলে দান, অবোধ সন্তানে তব॥

আপাততঃ আমি এইখানেই দ্বিতীয় বারের ভূমিকা শেষ করিলাম ইতি—

(পরিব্রাজক)

"হরিদ্বার হইতে কেদার ও ৺ বদরী-নারায়ণ।"

হরিদ্বার হইতে যাত্রা।

(১)

পরদিন প্রাতঃকালে হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের জলে স্নান করিয়া নিকটস্থ ক্ষুদ্র মন্দিরে হরিপাদপদ্ম দর্শন করিলাম। তৎপরে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। এমন সময়ে দেখি, পাণ্ডার ঘরের পার্শ্বস্থ অপর এক প্রকোষ্ঠে দুইজন বাঙ্গালী যুবক পরস্পর আলাপ করিতেছে। এই সুদূর প্রবাসে বাঙ্গালীর মুখ দেখিয়া, প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। বিপদে পড়িলে লোক সমুদ্রমধ্যেও তৃণ অবলম্বন করিয়া থাকে। আমি তাহাদের সহিত পরিচয়ে জানিতে পারিলাম, উভয়ে ব্রাহ্মণ। এক জনের নাম শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ইনি ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জের নিকট মুরাপাড়া নামক গ্রামে

মাষ্টারী করেন। ইহার দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ দেহ এবং সুদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি দর্শন করিয়া বলিলাম—মহাশয়, আপনারা এখান হইতে কোথায় যাইবেন? তাহার পার্শ্বে আর একটী বাঙ্গালী যুবকও ছিল, তাহার নাম শ্রীঅমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায় বাড়ী যশোহর জিলায়, দেখিতে অতি কৃশ, "যেন তালপাতার সিপাহী", কিন্তু অদম্য মানসিক তেজে বলীয়ান, তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আমরা দুইজনে সম্প্রতি কনখলে যাইব। কনখল হরিদ্বার হইতে বেশীদূর নয়, এখানে গঙ্গা ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়াছেন। (এইখানে দক্ষ-যজ্ঞ হইয়াছিল—দক্ষরাজার বাটী আছে—সতী পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া যেস্থানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থান এবং যজ্ঞকুণ্ড প্রভৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে।) এই সব দেখিয়া পুনরায় হরিদ্বারে আসিব, তারপর এখান হইতে বরাবর পদব্রজে হাঁটিয়া "কেদার ও বদরী-নারায়ণ" যাইব। আপনি কোথায় যাইবেন? আমি একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, তারপর বলিলাম,—ভগবান জানেন আমি কোথায় যাইব। এখন আমার একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা—ক্ষুধা পাইলে যে এক পয়সার ছাতু কিনিয়া খাইব এমন সাধ্য নাই। "এখন হইতে সকলি ভগবানের উপর নির্ভর" তিনি দয়া করিয়া যদি খাওয়ান তবে

থাকিব, নতুবা উপবাস করিয়াই কাটাইব। ভাবিলাম, যাহার দয়ায় অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, তিনি কি একটী ক্ষুদ্র প্রাণীর আহারের সংস্থান করিবেন না। তবে যদি একান্তই না জোটে, উপবাস ত করিতে পারিব! এ সুদূর প্রবাসে হিমালয়ের উপত্যকায় নির্জ্জন কাননে আত্মীয়বন্ধু-বান্ধবশূন্য স্থলে এক 'ভগবান' ভিন্ন আর কে আহার জোগাইবে? তাহার একান্ত ইচ্ছা যদি না হয়, তা'হলে অনাহারে পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ হয় সেও ভাল, তথাপি একবার ভগবান্ ৺কেদার ও বদরী-নারায়ণ দর্শন করিব। এইরূপ মনে মনে সংকল্প করিয়া এই বাঙ্গালী যুবকদ্বয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি, এমন সময়ে দেখি, সঙ্গী হিন্দুস্থানীর দল তল্পীতল্পাদি, সব বাঁধিতেছে; তাহারা সকলেই অদ্য বদরীকাশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিবে। এক জন অল্প বয়স্ক বেঁটে পাণ্ডা ইহাদিগকে হরিদ্বার হইতে কেদার ও বদরী-নারায়ণ লইয়া যাইবে। বালক পাণ্ডাটীর পায়ের মাংস পেশীগুলি অতিশয় দৃঢ় ও পুষ্ট দেখিলাম। আমি সবিস্ময়ে বালকের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। কি করিয়া এই ক্ষুদ্র বালক ভীষণ হিংস্রজন্তু সমাকুল নিবিড় অরণ্য, উচ্চ পর্ব্বত, গিরিসঙ্কট, নদী, বরফের স্তূপসকল

অতিক্রম করিয়া পথপ্রদর্শন করিবে। আমি এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে সেই পাণ্ডা ঠাকুর আমার প্রতি একটু হাসিয়া বলিল—বাবু! আমাদের অভ্যাস আছে, এইরূপ হরিদ্বার হইতে আরও দুই তিনবার যাত্রী লইয়া কেদার ও বদরী-নারায়ণ গিয়াছি। ইহাতে যেন আমার সাহস আরও বাড়িয়া গেল। এখন বুঝিতে পারিলাম, ভগবান নারায়ণ যেন এই ক্ষুদ্র বালকবেশে আমাকে ভরসা দিতেছেন, সুতরাং আমিও কালবিলম্ব না করিয়া আমার ছিন্ন কন্থা ও ক্ষুদ্র পিত্তলের ঘটাটি সঙ্গে লইলাম; পরে আমিও ইহাদের সঙ্গে পদব্রজে কেদার ও বদরীনাথ যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, পাণ্ডা ঠাকুর সম্মত হইলেন। ইহারা বাজার হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিলেন। এই দুর্গম পথে যাইতে হইলে—উচ্চ পর্ব্বতে উঠিতে হইলে, একটী বংশদণ্ডের বিশেষ প্রয়োজন, কারণ ইহার উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে হয়, আর পর্ব্বতের কঙ্করে আঘাত লাগিয়া পাছে পায়ের চামড়া ছিঁড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় পাহাড়ে উঠিতে এক রকম পাদুকা পাওয়া যায়, তাহাও যাত্রীরা এই হরিদ্বার হইতে ক্রয় করে। আর ভীষণ শীতের জন্য কম্বলের নিতান্ত প্রয়োজন; তাহা দরিদ্রই হউক আর সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীই হউক সকলেরই একান্ত প্রয়োজন।

নতুবা শীতে বরফের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে হয়, এজন্য তাহারা সকলে বংশযষ্ঠী, পাদুকা এবং কম্বল এই তিনটী অতীব প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিলেন ; কিন্তু আমার হাতে অর্থ না থাকাতে, আমি এই সব জিনিষ কিনিতে না পারিলেও বিনা বাক্যব্যয়ে ইহাদের সহিত হরিদ্বার হইতে পদব্রজে বরাবর সত্যনারায়ণ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে একখানি জীর্ণ কন্থা আর ছোট একটী ঘটী আছে, এই সম্বলমাত্র লইয়া সেই দূরদেশে ভগবানের নাম মনে স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। ইহা দেখিয়া সঙ্গের পাণ্ডাটী কহিল—বাবু! জ্যৈষ্ঠ মাস হইলে কি হয়, এ যে ভয়ানক শীতের রাজ্যে যাইতেছেন, তাহা কি বুঝিতেছেন না, ভয়ানক বিপদ হইবে। একখানা কম্বল কিনুন, এক গাছা লাঠী ও এক জোড়া পাদুকা, এখনও সময় থাকিতে হরিদ্বার হইতে ক্রয় করিয়া আনুন, পথে এসব মিলিবে না, নহিলে পর্ব্বতের উপর উঠিতে গেলে, পাথরের 'নুড়ীর' আঘাতে পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইবে। আমি বলিলাম—তা হয় হবে। এই বলিয়া আমি শ্রীশ্রীদুর্গা বলিয়া তাহাদের সঙ্গে যাত্রা করিলাম। সঙ্গের সন্ন্যাসী ঠাকুরটী চিম্‌টা ও কমণ্ডলুহস্তে সকলের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, আমরা যাত্রীর দল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। পশ্চিম দেশীয় লোকেরা অত্যন্ত

সাধুভক্ত, এই সাধুটীকে তাহারা যেরূপ যত্ন ও ভক্তি করিতে লাগিল, এরূপ অন্য কোথাও দর্শন করি নাই। দলের সকলেই সাধু বাবা! সাধু বাবা বলিয়া অস্থির, কিন্তু সাধু বাবা মৌনী থাকায় কাহারও সহিত কথা কহেন না। এইরূপে আমরা ক্রমান্বয়ে উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তখন বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়াছে, জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ সূর্য্য কিরণে, পাহাড়ের পাথরগুলি তাঁতিয়া উঠিয়াছে, তাহার কণাগুলি পর্য্যন্ত অগ্নির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। মনে হইল, পায়ে যেন ফোস্কা পড়িতে লাগিল—পায়ে জুতা নাই, মনে করিলাম এখনও সময় আছে ফিরিয়া যাই কিন্তু আর উপায় নাই, যখন যাত্রা করিয়াছি—অনেক দূরেও আসিয়া পড়িয়াছি যা থাকে 'অদৃষ্টে' যাইবই এতে প্রাণ যায় সেও ভাল! 'মৃত্যু' তাহাত অবশ্যম্ভাবী, যাহা একদিন হ'বে তাহার জন্য ভাবিলে আর কি হইবে। মন্দ কি? যদি ভগবান বদরী নারায়ণ দর্শন করিতে যাইয়া অনাহারে পথিমধ্যে মৃত্যু হয় সেও ত পরম সৌভাগ্য! এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সকলেই নীরবে চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে দুই একটী কথা হইতেছে, এক পশ্চিম দেশীয় বৃদ্ধ পণ্ডিত সঙ্গে আছেন, তিনি এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ সাধু বাবা বিশ্রাম করিয়ে," দেখিলাম

সাম্নে একটী প্রকাণ্ড বিশ্রাম করিবার ঘর আছে। শত শত যাত্রীর দল সেখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। আমরাও সকলে মিলিয়া বিশ্রামাগারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে চলিলাম। দারুণতৃষ্ণায় বুকের কলিজাপর্য্যন্ত শুকাইবার উপক্রম হইয়াছে। শুনিলাম এই পথে মধ্যে মধ্যে এইরূপ বিশ্রাম গৃহ আছে, সদাশয় "গভর্ণমেণ্ট" যাত্রীদের সুবিধার জন্য ইহা করিয়া দিয়াছেন। এখানে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া ভাবিলাম, একটু জলপান করি, এইমনে করিয়া কূপের নিকট গিয়া দেখি, কুপটী প্রায় ৫০।৬০ হাত গভীর, যাত্রীদের সকলের ঘটীতেই দীর্ঘাকার রজ্জু সংলগ্ন আছে, তদ্বারা জল উত্তোলন পূর্ব্বক পান করিতেছে। আমি অগত্যা যাত্রীদের একজনের নিকট হইতে একটী ঘটি চাহিয়া লইয়া, আকণ্ঠ সেই কূপজল পান করিলাম। তারপর নিকটস্থ চটীর দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

এইরূপ সুদূর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে হইলে ৪।৫ চারি পাঁচ মাইল অন্তর একটী করিয়া চটী অর্থাৎ যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার আছে। তথায় যাত্রীরা ডাল, রুটী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া আহার করে। এইসব চটীতে পাহাড়ী

আটা, সৈন্ধব লবণ, ঘৃত ও ডাল ইত্যাদি জোগাড় করিয়া রাখে। ছোট ছোট সারি সারি চুল্লী সাজানো রহিয়াছে, শুকনো কাঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সব দ্বারা যাত্রীরা আহারাদি করিয়া রাত্রিতে চটীতে থাকিয়া নিদ্রা যায়। নতুবা এই ভয়ানক পর্ব্বতোপত্যকায় হিংস্রজন্তু সমাকুল অরণ্য মধ্যে আর কোথাও আশ্রয়স্থান নাই। তাই সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যাত্রীর দল চটীতে আসিয়া আড্ডা লয়। তারপর প্রভাত হইলেই এক চটী হইতে অন্য চটীতে গমন করিয়া থাকে ইহা ভিন্ন চলিবার অন্য উপায় নাই।

এইরূপ ভাবে যাইতে যাইতে আমরা সকলে সন্ধ্যার সময় হরিদ্বার হইতে সাড়ে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত সত্য-নারায়ণের মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

এখানে দেখি ভয়ানক যাত্রীর ভিড়। স্বর্গীয় কালী-কম্বলিওয়ালা নামক একজন বিখ্যাত সাধু যাহাতে অসহায় যাত্রী ও সাধু সন্ন্যাসীর, এখান হইতে কেদার ও বদরী নারায়ণ পর্য্যন্ত যাইতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, সেজন্য স্থানে স্থানে দাতব্য ভাণ্ডার এবং পীড়িতের চিকিৎসার জন্য অনেক দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করিয়াছেন। সকল যাত্রীর মুখেই এই পুণ্যাত্মার নাম শুনা যায়।

একখানা ছাপান ছাড়পত্র গদী হইতে নিলে তবে

ভাণ্ডার হইতে একজনের পরিমাণ আটা, সৈন্ধব, ঘৃত, ডাল ইত্যাদি ভাণ্ডারীরা প্রদান করে।

এই পথে যাইতে অনেকের সঙ্কটাপন্ন আমাশয় এবং পেটের পীড়াদি জন্মিয়া থাকে সেজন্য, 'দাতব্য' ঔষধভাণ্ডার হইতে যাত্রীদের জন্য অনেক রকম ঔষধাদি প্রদত্ত হয়। আমিও কিছু ঔষধ সঙ্গে লইলাম, এইরূপ স্থানে স্থানে এই বিখ্যাত সাধুটীর অনেক কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। জল পিপাসায় ভয়ানক কষ্ট পাইতে হয় বলিয়া, যে স্থানে জল নাই এমন উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে ইহাদের লোক পার্ব্বতীয় বড় কলসীতে জল লইয়া যাত্রীদের প্রদান করিয়া থাকে। আহা! যাত্রীরা যখন পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া এই দুর্গম উচ্চপর্ব্বতে যখন জল বিনা হাহাকার করে, তখন এই বাবা কালী কম্বলি-ওয়ালার প্রতিষ্ঠিত জলছত্র হইতে দুই হাতে অঞ্জলি পুরিয়া জলপান করিতে করিতে স্বর্গীয় সাধুর প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বাণী প্রয়োগ করিয়া থাকে।

সন্ধ্যাকালে সুমধুর শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরাদির শব্দে কানন ভূমি প্লাবিত করিয়া তুলিল, শুনিলাম মন্দিরে সত্যনারায়ণ জিউর আরতি হইতেছে। এখানের পাহাড়গুলির উচ্চতা অতি অল্প, প্রায় সমতল ভূমির মত চতুর্দ্দিকে শাল, বাদাম, হিন্তাল প্রভৃতি বৃক্ষবেষ্টিত নিবিড় কানন রহিয়াছে।

আরতির বাজনা শুনিয়া আমরা সকলে সত্যনারায়ণ জিউর মঙ্গল আরতি দর্শন করিতে গেলাম। সমবেত যাত্রী মণ্ডলীর কি ভক্তি ভাব! একদৃষ্টে সত্যনারায়ণ প্রতি চাহিয়া আছে আর দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। পশ্চিম হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের কি ভক্তি! যেন নয়ন হইতে গঙ্গা অবিরতধারায় বর্ষণ হইতেছে, অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও এ স্থানে আসিলে ভক্তিতে দ্রবীভূত হইয়া যায়। এজন্যই বোধ হয় শাস্ত্রে সাধু সঙ্গ ও তীর্থ ভ্রমণাদি মানব-জাতির মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নারায়ণের শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিলেই প্রাণে অপূর্ব্ব ভক্তি রসের উদ্রেক হয়, হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়; ঐ মূর্ত্তিমধ্য হইতে যেন তীব্র শুভ্র জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে দেখিলেই মনপ্রাণ শীতল হয়। কিছুক্ষণ পরে আরতি শেষ হইলে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আমরা সকলে নিকটস্থ আম্র কাননে যাইয়া আড্ডা করিলাম। যাত্রীরা যে যার কম্বল মুড়িয়া শুইয়া পড়িল। এখান হইতে কেদার ও বদরী-নারায়ণ পদব্রজে যাইতে হইলে প্রায় ২৮ আটাশ দিনের রাস্তা হইবে, পথে অন্ন জুটিবে কিনা সন্দেহ, তাই অনেক স্তূপাকার ইট হইতে কয়েকখণ্ড ইট

করিয়া দিল। আমি আমার কন্থাখানি লইয়া আম্রবৃক্ষের এক কোণে ছড়াইয়া শুইয়া আছি, এমন সময়ে ঐ দলের একটী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক অত্যন্ত দয়াশীলা আমাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাবা! তুমি যে কিছু খাইলে না? আমি বলিলাম—মাঞী! আমার সম্বল কিছুমাত্র নাই, আমি কিছুই খাইব না, এই কথা শুনিয়া সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি একটী পুঁটুলী বাহির করিল। তাহা খুলিয়া কিছু চাল, ডাল, নুন, বাড়ী হইতে আনীত উৎকৃষ্ট আচার প্রভৃতি আমাকে প্রদান করিল এবং আমাকে পাক করিয়া খাইবার জন্ম অনুরোধ করিল। আমি গাত্রোত্থান করিয়া নিকটস্থ স্তূপাকার ইষ্টক হইতে তিন খণ্ড ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা চুল্লী প্রস্তুত করিয়া খিচুড়ী পাক করিলাম, পরিশেষে আহারান্তে ঐ আম্রকাননের ভিতর নিজ ছিন্নকন্থাখানি দ্বারা আপাদমস্তক মুড়িয়া শুইয়া পড়িলাম। নীরব নিস্তব্ধ রজনীতে সেই বিশাল অরণ্যমধ্যে সহসা ঝিল্লীরব ও নানাবিধ পক্ষীর শব্দে কাণ ঝালাপালা হইতে লাগিল। এমন অদ্ভুত শব্দ জীবনে কখনও শুনি নাই। ইহার একটু পরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। তার পরদিন প্রাতঃকালে নিকটস্থ ঝরণার জলে হাত, মুখ, ধুইয়া শ্রীদুর্গা বলিয়া "হৃষিকেশ" অভিমুখে ধীরে ধীরে যাত্রা করিলাম।

হরিদ্বার হইতে পদব্রজে প্রায় দুইশত মাইল কষ্টকর পার্ব্বতীয় পথ অতিক্রম করিয়া তবে বদরী-নারায়ণ যাওয়া যায়, সেজন্য পথে বিশ্রাম খুব কমই করিতে লাগিলাম। সত্যনারায়ণ হইতে সওয়া মাইল দূরবর্ত্তী বীবীবালা নামক চটী অতিক্রম করিয়া আরও তিন মাইল অগ্রসর হইলে, আমরা হৃষিকেশ নামক স্থানে আসিয়া পড়িলাম।

এখনও সমতল রাস্তায় চলিতেছি ক্রমে আরও দূরে গেলে পর্ব্বতে চড়াই এবং উত্তরাই উত্তীর্ণ হইতে হইবে। সে অতি কঠিন ব্যাপার এখানে দেখি সকলের হাতেই প্রকাণ্ড বংশদণ্ড অথবা সুদীর্ঘ যষ্ঠী। উহার সাহায্যে ধীরে ধীরে স্বর্গের মত উচ্চ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে হয়, ইহাকে চড়াই বলে। আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে হয়, তাহাকে উত্তরাই বলে।

হৃষিকেশে আসিয়া গঙ্গার ধারে আমরা সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। তখন বেলা প্রায় ৯ টা হইবে। মহানন্দে গঙ্গাজলে সকলে স্নান করিয়া আহ্নিকাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুনরায় বিশ্রাম করিতেছি। সঙ্গী লোকেরা যে যার পাকের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

আমি উঠিয়া এদিকে ওদিকে ভ্রমণ করিয়া সেই মনোহর-দৃশ্য তপোবনগুলি একে একে দর্শন করিতে লাগিলাম।

সত্যযুগে কত মুনি-ঋষিগণ এস্থানে আজীবন তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, এমন পবিত্র স্থান দর্শন করা জীবনে মহা-সৌভাগ্য মনে করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া দেখি বিরাট ব্যাপার, যেন বিরাট সন্ন্যাসীর মেলা বসিয়াছে। ইতোপুর্ব্বে যাইবার সময় যাহাদিগকে দেখি নাই, এখন এবম্বিধ পিপীলিকাশ্রেণীবৎ অগণিত সন্ন্যাসীর দল কোথা হইতে আসিল ? ইহারা কোথায় থাকেন ? নিকটে একটী লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সন্ন্যাসীগণ উচ্চ পর্ব্বতে থাকেন, বেলা ১০ দশটার সময় ইহারা নীচে নামিয়া আসেন। পূর্ব্বোক্ত সাধু ৺কালী কম্বলীওয়ালা এখানে সাধুদের জন্য অন্ন ছত্র খুলিয়া দিয়াছেন। দেখিলাম একটী বিরাট রন্ধনগৃহে রাশি রাশি স্তুপাকার রুটী ডাল ও অন্ন সাজান রহিয়াছে। সাধুরা একটীর পর একটী করিয়া যে যাহার অভিরুচি একটুকুরা রুটী, ডাল, ভাত ব্যঞ্জন লইয়া যে যার স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছে। এমন তেজঃপুঞ্জ কলেবর প্রশান্ত মূর্ত্তি ইতোপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। কেহ দীর্ঘ, কেহ খর্ব্ব অতি অদ্ভুতবেশ পরিধানে গৈরিক বসন কাহারও কর্ণে বলয়সদৃশ গোলাকার মাকড়ীর মত ঝুলিতেছে। এসব দেখিয়া মনে করিলাম পশ্চিমদেশীয় লোকদের বেশ সাধু সেবা ও ভক্তি আছে।

আমার অনাহারক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া একটী সাধু যাইবার সময় দয়া করিয়া আমাকে প্রকাণ্ড একখানা রুটী এবং কিছু ডাল দিয়া পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলেন।

আমি মনে মনে আশ্চর্য্য হইলাম। আমি সাধুর নিকটে কিছুত চাই নাই তবে ইঁনি কেমন করিয়া জানিলেন যে আমার অদ্য আহার হয় নাই। ভগবানের দান মনে করিয়া অতিতৃপ্তি ভাবে, ঐরুটী ভোজন করিয়া অনেক পরিমাণ গঙ্গাজল পান করিলাম। এখানে অসংখ্য সারি সারি দোকান, বাজারের মত দুই পার্শ্বে শোভা পাইতেছে। দেখিলাম একটী সদাশয় লোক রাশি রাশি সন্দেশ, বরফি ও জিলাপী বিতরণ করিতেছেন। একটী সাধু আমাকে দেখিয়া ঐসব লইতে বলিলেন। দোকানী প্রায় আধসের বরফি ওজন করিয়া দিল। আমি ভগবানের দান ভাবিয়া, বস্ত্রের এককোণে তাহা সযত্নে বাধিয়া লইলাম; যদি পিপাসা লাগে তবে একটু ভাঙ্গিয়া তদ্বারা জলযোগ করিব। এখানে কি ভয়ানক গরম, পদতলে পাহাড়গুলি তপ্ত হইয়া যেন অগ্নিবৎ হইয়াছে। চলিতে চলিতে পায়ের তলায় ফোস্কা পড়িয়া যায় সুতরাং একটু বিশ্রাম পূর্ব্বক হৃষিকেশ দর্শন করিয়া এখান হইতে বেলা আন্দাজ দুইটার সময় আমরা

পূর্ব্বে সেই পরিচিত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ; তারপর ক্রমে ক্রমে দশবার জন হিন্দুস্থানী লোক, একজন পণ্ডিত, কয়েকটী যুবক ও একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাহার মস্তকে একটী প্রকাণ্ড পুঁটুলী রহিয়াছে। ইহারি মধ্যভাগে মনে মনে আমি নিঃশঙ্কচিত্তে ভগবানের নাম লইয়া ক্রমশঃ মৌনাকী রেতী নামক চটী পার হইয়া লছমন্‌ঝোলার নিকটে আসিয়া পড়িলাম। দুইধারে পর্ব্বতের রমণীয়া শোভা অতি আশ্চর্য্য নীচে তরতরে সবেগে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। গাছপালা নীরব এবং নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। প্রকৃতির সেই নয়নানন্দ সুঠাম দৃশ্য দেখিলে ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বালা ভুলিয়া যাইতে হয়, প্রাণ এক অভিনব রাজ্যে প্রবেশ করে। এই লছমন্‌-ঝোলাটী গঙ্গার উপর অবস্থিত ; এখানে গঙ্গাপার হইতে অনেক যাত্রীর প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় একটী সদাশয় লোক এই অপূর্ব্ব লৌহ সেতুটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সেতুর সন্নিকটে একটী মন্দিরে রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং সীতাদেবীর মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তি দর্শন এবং প্রণাম করিয়া, আমরা লৌহ সেতুটী পার হইলাম। নীচের দিকে চাহিলাম শরীর কম্পিত হইতে লাগিল এস্থান ভয়ানক, গভীরা গঙ্গা কল কল ধ্বনি করিয়া সবেগে ছুটীয়াছে। এই সেতুটী নদীর এপার ওপারে লম্বিত হইয়া যেন শিকলীর মত দুলিতেছে, পড়িয়া

যাইবার আশঙ্কা নাই। তাই অতি আনন্দে সকলে সেতু পার হইলাম। অস্পষ্ট মনে হয় বদরিকাশ্রম যাইতে অনুমান এইরূপ একশত লৌহ সেতু পার হইয়াছি।

হিমালয়ের চতুর্দ্দিকেই বিভিন্ন বিচিত্র শোভাসকল দর্শন করিয়া ক্রমে ফুলবাড়ী এবং গূলর চটী অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে মৌনা চটীতে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম; দুইধারে অনন্ত পর্ব্বত শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। এইস্থানে গঙ্গা অনেক নীচুতে আছে অনেক যাত্রী গঙ্গাজল পান করিবার আশায় নীচে নামিল এমন সময়ে সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ভয়ানক কর কর রবে বিকট গর্জ্জন করিতে লাগিল ক্রমে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল দেখিয়া যাত্রীরা উপরে আসিয়া চটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল, ঘরটী অতি প্রকাণ্ড লম্বা প্রায় শতাধিক যাত্রী এইস্থানে থাকিতে পারে। সারি সারি উনান পাতা রহিয়াছে। অনেক হিন্দুস্থানী আটা গুলি হাতে পিটিয়া রুটীর মত করিয়া আগুনে সেঁকিয়া খাইতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত সদাশয়া স্ত্রীলোকটী আমাকে দুইখানি রুটী তৈয়ারী করিয়া দিল আমি আমার সঞ্চিত বরফির টুকরা দ্বারা জলযোগ করিয়া, সেই চটীর এক কোণে কাঁথা খানি বিস্তার করিয়া শয়ন করিলাম এবং অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

তার পরদিন এই মৌনা চটী হইতে সকলে যাত্রা করিয়া তিন মাইল দূরবর্ত্তী বিজনী চটীতে আসিয়া পড়িলাম, এখান হইতে চড়াই আরম্ভ হইল। সেই অভ্রভেদী পর্ব্বতের শৃঙ্গগুলি যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, একদল নাগা সন্ন্যাসী বিদ্যুৎবেগে "আলেক" "আলেক" ধ্বনি করিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে উপরে উঠিতে লাগিল।

আমরা সকলেই ক্রমে উপরে উঠিতে লাগিলাম, মনে হইল যেন স্বর্গে উঠিতেছি। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কেহ কেহ হাঁফাইতে লাগিল, এমন কষ্টকর দুরারোহ পর্ব্বত বুঝি আর নাই, মনে হইল এ পথের যেন আর শেষ নাই। মাইল খানেক উপরে উঠিয়া পর্ব্বতোপরি একটী ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়া সেই খানে পুনরায় সকলে মিলিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। নীচের দিকে চাহিলে হৃদকম্প উপস্থিত হয় কত নদী, ঝরণা প্রভৃতির অপরূপ দৃষ্ট করিলে আত্মহারা হইতে হয়।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীটী নীচে মৃগচর্ম্মে বসিয়াছিলেন আমাকে দেখিয়া একটু মৃদু হাস্য করিলেন তারপর ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিলেন, বাবু! এই নব দৃশ্য দেখিতে কেমন? আমি বলিলাম অতি চমৎকার। এই প্রথম সন্ন্যাসী আমার সহিত কথা কহিলেন। একাদিক্রমে ৩।৪ দিন ভ্রমণ করিয়াও

ইঁহার মুখ হইতে একটী কথাও শুনিতে পাই নাই। ক্রমে ভাগবৎ বিষয় অনেক কথাই হইল। দেখিলাম সন্ন্যাসী "মায়াবাদী" (ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা) এই জ্ঞানই তাঁহার সার মর্ম্ম। সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন এই চতুর্দ্দিকে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই মায়াময়। আত্মাই পরম বস্তু, জ্যোতিরও জ্যোতি, মহাজ্যোতির কিরণ ছটা সকল এই পরমাত্মা ব্রহ্মেরই অঙ্গজ্যোতি, একমাত্র তিনিই সত্য, এই জগত এবং জীবজন্তু সমুদয় হচ্ছে ইহারই মায়া; এই ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য পদার্থ। এই মায়িক জগৎ স্বপ্ন দৃষ্টের মত অতি অপূর্ব্ব বস্তু, ইহার সত্তা অস্বীকার করিবার যো নাই, আবার নিত্যও নহে, এই মায়া অতি আশ্চর্য্য, যুগ যুগান্তর সাধন করিয়াও এই মায়াকে কেহ সহসা বুঝিতে পারে না? তবে স্বপ্ন ভাঙ্গা হইলে যেমন লোকের স্বপ্ন বিষয়ের স্মৃতি কখন থাকে, কখন থাকেনা, সেই-রূপ জীবের ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলে মায়াময় স্বপ্নরূপ জগত বিষয়ের স্মৃতি জ্ঞান কখন থাকে, কখন থাকেও না, জীবের সাধনপথে সবিকল্প সমাধিতে অল্পমাত্র স্মৃতিজ্ঞান থাকে, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অর্থাৎ মহাসমাধিতে সমস্তই মুছিয়া যায়, স্মৃতিটুকুও থাকেনা। যাহার এইরূপ অবস্থা হয় তিনিই কেবল-মাত্র এই মহামায়ারহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন?

আসিয়া প্রকাশ করিতে না পারিয়া মূকের মতন নির্ব্বাক্ হইয়া থাকেন।

যদি কেহ রজনীতে স্বপ্ন দেখে তখন একজন লোকই নিজেকে কত ভাবে নানা মূর্ত্তিতে দেখিতে পায়। স্বপ্নভঙ্গে সেইসব কোথায় মিলাইয়া যায় তাহার ঠিক থাকে না।

জাগরিত হইলে সেই স্বপ্নের বিষয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্দ্ধান করে। যদি বা কখন স্মৃতিরূপে থাকে তবে সেই স্বপ্নকালীন স্বপ্নের বিষয়সমুহ অস্বীকার করিবার যো নাই, আবার জাগরিত হইলে তাহার আস্তিত্বও থাকে না। সেই সব স্বপ্নরাজ্যের বর্ণনা তাহার নিজ ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে, সেইরূপ জীবের জাগরণরূপ আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নরূপ জগন্মায়া অন্তর্দ্ধান করে। এইসব, শিষ্যের নিজে সাধন করিয়া অনুভব করিতে হইবে। গুরু কেবলমাত্র পথ প্রদর্শন করিয়া দিবেন, শিষ্য সেই সাধনারূপ নির্দ্দিষ্ট পথে গমন না করিলে, কি করিয়া অভীষ্টস্থান পরমবস্তু "আত্মজ্ঞান লাভ" করিবে।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী মৌনাবলম্বন করিলেন, কি আশ্চর্য্য সংযমশক্তি! যতদিন ছিলাম তাহার নিকট আর কোন কথাই শুনিতে পাই নাই। তিনি আপাততঃ মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত যোশী মঠ পর্য্যন্ত যাইবেন তাহার পর

কোথায় যাইবেন কি করিবেন কে জানে। ইহার পর ক্রমান্বয়ে ৭।৮ সাত আট দিন চলিতে লাগিলাম। সামান্ত দুই এক মুষ্টি ছোলা এবং গুড় ব্যতীত অদৃষ্টে কিছুই জুটিল না। দুইধারে অসংখ্য পর্ব্বত মালার উচ্চ শৃঙ্গগুলি যেন মেঘ স্পর্শ করিয়াছে। কত সুদৃশ ঝরণা, প্রপাত আদির ঝর ঝর শব্দে প্রাণে যুগপৎ অনির্ব্বচনীয় সুখ এবং আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে যে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। হিংস্রজন্তু পরিপূরিত শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ গিরিকানন দুরারোহ উচ্চ শৈলশেখর অনাহারে আসন্ন মৃত্যুভয় কিছুতেই সংকল্পের বাঁধা জন্মাইতে পারিল না। "মৃত্যু" সেত অবশ্যম্ভাবী একদিন হবেই, তার জন্যে আর চিন্তা কি ? যখন ভগবান বদরী নারায়ণের নিকট চলিয়াছি তখন আর ভয় কি ? এ পথে যাইতে মৃত্যু হইলে জীবনকে শত শত ধন্যবাদ দেই। কোন জাহাজ কুল ছাড়িয়া অকুল মহাসমুদ্রে পতিত হইলে তাহার আরোহীবর্গের উক্ত মহাসাগরের অনন্ত সুনীল জলধি-রাশির তরঙ্গ দেখিয়া যেমন আত্মহারা হয়, আমার অবস্থা তদ্রূপ হইয়াছিল। তা না হলে যে বাঙ্গালী এক বেলা ভাত না খাইলে চক্ষে পৃথিবী অন্ধকার দেখে তাহার পক্ষে এই সুদূর দুর্গম পথে সহায় সম্বলহীন অবস্থায়, উপবাসী থাকিয়া ক্রমাগত পার্ব্বতীয় পথে ৫।৬ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া ভগবান

'কেদার ও বদরীনারায়ণের' অপার কৃপা ভিন্ন কখনই সম্ভবপর নহে। আমিও তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং দয়ার উপর নির্ভর করিতে লাগিলাম, তিনি যদি দয়া করিয়া আহার যোগাড় করিয়া দেন খাইব, নতুবা অনাহারে মরিয়া যাইব। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, কি হইবে কি করিয়া চলিবে এ চিন্তা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলাম। এই অতুলনীয় প্রাকৃতিক মনোহর সৌন্দর্য্য যদি না থাকিত তবে বোধ হয় একপদও অগ্রসর হইতে পারিতাম না। সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য ভগবানের সুবিমোহন প্রকৃতির রাজ্যে কিছুরই অভাব নাই, এজন্য তাহার সর্ব্বভয়বিনাশন অভয়নাম স্মরণ করিয়া প্রতিপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আবার "ভগবানের" উপর একান্ত বিশ্বাস এবং নির্ভর না করিলে তাহার কৃপা হয় না তাই তাঁহারই পবিত্র নাম মনে মনে স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এ পথে গুজরাট, মাড়োয়ারী, বোম্বাই, মাদ্রাজী, মহরাষ্ট্রী, সিন্ধিয়া, পাঞ্জাবী প্রভৃতি যাত্রীদের সংখ্যাই অধিক বাঙ্গালী অতি অল্পই দেখিলাম, এমন কি নাই বলিলেও চলে। শুনিলাম কলিকাতার একদল যাত্রী আসিয়া পুনরায় চলিয়া গিয়াছে। তারপর যাহাদের সঙ্গে চলিয়াছি তাহারা হিন্দুস্থানী লোক, তাহারা দুইবেলা হাত তালি দিয়া পুরু পুরু রুটী তৈয়ার করে,

আর ছাতু খায়। আমার ও সকল খাওয়া অভ্যাস নাই সেইজন্য প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট অনুভব করিলাম। এ পথে যাইতে গেলে অগ্রে আহারাদির বিশেষ বন্দোবস্ত না করিয়া যাইলে পরিণামে দারুণ ক্লেশ পাইতে হয়। নির্ম্মল স্ফটিক সম গঙ্গাজল পান করিলে যেন আরও তীব্র ক্ষুধানলের উদ্রেক হয়। উদর পুরিয়া আকণ্ঠ পর্য্যন্ত ভোজন করিলেও গঙ্গা জলের এমনি গুণ তাহা ক্ষণকাল মধ্যে সব হজম হইয়া পুনরায় জঠরানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। এখানকার জলের গুণ অতি আশ্চর্য্য, দারুণ পিপাসায় অলকনন্দা মন্দাকিনী প্রভৃতি স্বর্গ গঙ্গার কাক চক্ষু সদৃশ নির্ম্মল সুশীতল জল পান করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত পিপাসার অবসান হইয়া জীবন পবিত্র বোধ হয়। একদিন রাত্রে একটী চটীতে বসিয়া তাহার এক কোণে কাঁথা খানি বিস্তৃত করিয়া একমনে আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত সদাশয়া হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটী আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, এ বাপ্! তুই না খাইয়া মরিয়া যাইবি—এই বলিয়া স্বহস্তে প্রস্তুত পুরু পুরু দুইখানি রুটী এবং কিঞ্চিৎ ডাল আমার নিকটে দিয়া খাইতে বলিলেন, আমি অস্বীকার করায় বলিলেন হামি ভাল জাত ব্রাহ্মণ আছি, তুঁহারা কোন দোষ হইবে না। খা—খা, এই বলিয়া একলোটা জলও আমার সম্মুখে ধরিলেন।

অনেক দিনের পরে এই সুদূর প্রবাসে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব-হীন বিদেশে মাতৃ-হৃদয় দেখিয়া সত্য সত্যই আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল। আমি অতি তৃপ্তির সহিত ঐ রুটী দুই-খানি খাইলাম জীবনে এমন খাইয়াছি বলিয়া বোধ হইল না, এরূপে সে রাত্রি যাপন করিলাম। কিন্তু ভগবানের কৃপায় এ ভীষণ কষ্ট শীঘ্রই ঘুচিয়া গেল। পরদিবস প্রাতঃকালে নিকটস্থ ঝরণার জলে হাত মুখ ধুইতে যাইতেছি এমন সময়ে দেখি সেই হরিদ্বারের পরিচিত বাঙ্গালী যুবক অমূল্য বাবু ঝরণার জল হইতে একটী ঘড়ায় জল তুলিতেছেন অমনি আমি আনন্দে চীৎকার করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করিলাম, তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন এবং বলিলেন রমেশ বাবু এখন চটীতে ঘুমাচ্চেন আসুন আমার সঙ্গে। আমি তাহার সহিত সুরেশ বাবুর অন্বেষণে তাহাদের চটীতে যাইলাম। এইরূপ সুদূর প্রবাসে যদি কেহ কখন আত্মীয়ের সহিত দেখা হয় তাহার আনন্দ তিনিই বুঝিতে পারেন; ভুক্তভোগী ভিন্ন এ আনন্দ কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই।

রমেশবাবুর সেই সবল দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারা এবং সেই দীর্ঘ বংশ যষ্টীটি দেখিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে করিয়া চাহিয়া রহিলাম। তখন তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে আমার

তাহার নিকট প্রকাশ করিলাম, বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে আমাদের আচার ও ব্যবহারে অনেক পার্থক্য আছে। বাঙ্গালী বাঙ্গালীর সঙ্গই ভালবাসে। আমি আপনাদের এত দিন দেখিতে-না পাইয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম, আপনারা কোথায় গেলেন, মনে মনে কেবল ইহাই ভাবিতে-ছিলাম। রমেশ বাবু বলিলেন কনখলে আমাদের কিছু বিলম্ব হইয়াছে, তার পরে এখানে আসিয়াছি আমরা কল্য যাত্রীদের মত ধীরে ধীরে গমন না করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কেদার এবং বদরীনারায়ণ পরিভ্রমণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব এমন মনস্থ করিয়াছি। কারণ জ্যৈষ্ঠ মাসের বন্ধের পর আমার স্কুল খুলিলেই আমি কার্য্যে যোগ-দান করিব। এইরূপ মনের সুখে তাহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম তাহারা বলিলেন, আমরা এখনই এ চটী ছাড়িয়া রওনা হইব। আপনি কি করিবেন? আমি বলিলাম, আপনারা একটু দাঁড়ান আমি শীঘ্রই আসিতেছি এই বলিয়া সেই হিন্দুস্থানী যাত্রী, বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, পণ্ডিত ও স্ত্রীলোকটীর নিকট হইতে সজল নয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা তিনজন মাত্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সেই দুর্গম পার্ব্বত্য পথে শনৈঃ শনৈঃ অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এইরূপে আমরা কুণ্ডচটী, বন্দরচটী, মহাদেব চটী, ওখলঘাট খণ্ডা,

কাটীচটী অতিক্রম করিয়া ব্যাসচটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নিকটস্থ গঙ্গায় আমরা তিনজনে মহানন্দে স্নান করিয়া ব্যাসদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, এই স্থানেই নাকি মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহাকে প্রণাম করিয়া চটীতে গমন পূর্ব্বক আহারের আয়োজন করিলাম, বাঙ্গালীর ভাত না হইলে শুধু রুটীতে চলে না সুতরাং এখন হইয়ত দিবসে আতপ অন্ন এবং রাত্রে রুটী খাইবার ব্যবস্থা হইল। আমরা সকলে মিলিয়া নিকটস্থ দোকান হইতে কিছু চাল, আলু, ডাল, ঘৃত, সৈন্ধব, কাষ্ঠ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি কিনিয়া আনিলাম। খাইবার বাসন এবং জল আনিবার একরূপ পার্ব্বতীয় ঘড়া দোকানদারেই দিয়া থাকে। আমি পাক চড়াইলাম, পাহাড়ীয়েরা মহিষ পালিয়া থাকে, এইপথে অকৃত্রিম মহিষের দুগ্ধ পাওয়া যায়। পাঁচ পয়সা, ছয় পয়সা করিয়া সের, আমি ভাত এবং ডাল পাক করিয়া আলু সিদ্ধ করিয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে দেখি, রমেশবাবু প্রায় দুই সের মহিষের দুধ এবং একছড়া কলা আনিলেন। আমি বলিলাম এত দুধ কিনিলেন কেন? তিনি বলিলেন, এই দুর্গম পার্ব্বতীয় পথে যাইতে গেলে আহারের বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা শরীর টিকিবে না। আমি ভাবিলাম তাহার বেশ বলিষ্ঠ শরীর বুঝি খুব খাইতে

পারেন। তারপর তিনজনে তিনটী বাসনে আহার করিতে বসিলাম, আমার সাত আট দিবস পরে এই প্রথম অন্ন আহার। সেই সত্যনারায়ণ মন্দিরের নিকট আম্র কাননে পাক করিয়া খাইয়াছি, আর এই অন্ন আহার। সুতরাং ভাত, ডাল, দুধ, ঘৃত, প্রভৃতি দ্বারা আকণ্ঠ পুরিয়া ভোজন করিলাম যে, উত্থানশক্তি রহিত হইয়া গেল। রমেশ বাবু ভাত এবং দুধ সব খাইতে না পারায় আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম কেমন রমেশবাবু! এখন যে পাতে রহিল, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন আর পারা যায় না এই বলিয়া হাত, মুখ, প্রক্ষালন করিলেন।

এইরূপে আচমন কার্য্যাদি সমাপন করিয়া একটী দ্বিতল প্রকোষ্ঠে আমরা তিনজনে কম্বল পাতিয়া এক শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রামগ্ন হইলাম। বলা বাহুল্য এখন হইতে রমেশবাবু এবং অমূল্যবাবুই যেন ভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমার আহারের সংস্থান করিয়া দিতে লাগিলেন। বেলা অপরাহ্ন সময়ে অমূল্যবাবু গা নাড়া দিয়া বলিলেন, আর বেলা নাই শীঘ্র যাইবার আয়োজন করি, আমরা তিনজনে শশব্যস্তে উঠিয়া যাত্রা করিলাম। আমার সম্বলের মধ্যে একখানি কাঁথা এবং ক্ষুদ্রকায় একটী ঘটী, পাহাড়ের উপর উঠিতে বেগ পাইতে হয় দেখিয়া, নিকটস্থ অরণ্য হইতে

একটী যষ্টি যোগাড় করিলাম। এই ব্যাসঘাটে আসিতে ভয়ানক উত্তরাই করিতে হইয়াছিল, বিজনী চটীতে যেমন পাহাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আরোহণ (চড়াই) করিয়াছি এখন তেমন ব্যাসচটীতে আসিতে (উত্তরাই) অর্থাৎ পর্ব্বতটী ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনরায় (উত্তরাই) আরোহণ করিয়া নীচে নামিতে হইয়াছিল, এইরূপে ক্রমাগত চড়াই এবং উত্তরাই করা এক ভীষণ কাণ্ড, রমেশবাবু চড়াই করিতে বিশেষ পটু ছিলেন না। আমি আর অমূল্যবাবু দুইজনেই কৃশ, তথাপি পর্ব্বতে উঠিবার সময় আমাদের সঙ্গে রমেশবাবু আটিয়া উঠিতে পারিতেন না। ঘন ঘন হাঁফাইতেন আর মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিতেন, আমরা দুইজনে দুই এক মাইল দূরে যাইয়া বিশ্রাম করিতাম রমেশবাবু নিকটে আসিলে হাসিতাম আর বলিতাম, রমেশবাবু! চড়াই কেমন হইল? তিনি আর থাকিতে না পারিয়া কহিলেন—

আচ্ছা উতরাইর বেলা দেখা যাবে। অর্থাৎ অবরোহণের সময়ে আমরা দুইজনে রমেশ বাবুর নিকটে হার মানিতাম। তিনি তাহার পদদ্বয় দীর্ঘ যষ্ঠী সাহায্য এরূপ ক্ষিপ্রগতিতে চালাইতেন যে আমাদের নিকট হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেন। আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিতাম না। এইরূপে আনন্দে আমরা ঝালরী

চটী, উমরাস্থ চটী, সোঢ়িয়া জলের ঝরণা অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার সময়ে আমরা তিন জনে একটী লৌহ সেতু পার হইয়া "দেব প্রয়াগে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

দেব প্রয়াগ।

নদীর অপর পার হইতে এই "দেব প্রয়াগ" নগরীর দৃশ্য অতি সুন্দর দেখা যায়। অমূল্যবাবু আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন—কি শোভা! কি শোভা! প্রকৃতিদেবী যেন তাহার অনন্ত ভাণ্ডারের শোভারাশি একত্রিত করিয়া হিমালয়ের এই নির্জ্জন প্রদেশ "দেব প্রয়াগে" আনিয়া রাখিয়াছেন, যে অতৃপ্তি নয়নে সহস্র বার দর্শন করিলেও পিপাসা মেটে না। এইখানে গবর্ণমেণ্টের টেলীগ্রাম এবং পোষ্ট আফিস আছে। আর গঙ্গার ধারে একটী প্রকাণ্ড অতিথিশালা আছে, তাহাতে অসংখ্য যাত্রীর ভিড়; কত সাধু-সন্ন্যাসী ও যাত্রীর দল দেখিলাম তাহার সংখ্যা নাই। দোকান বাজার সবই আছে। "দেবপ্রয়াগে" অনেক পাণ্ডা বাস করিয়া থাকে, তাহারা যাত্রীদিগকে কেদার এবং বদরিকাশ্রম লইয়া যায়। আমরা পাকের আয়োজন না করিয়া নিকটে দোকান হইতে লুচী, হালুয়া

এবং কিছু মিষ্ট আনিয়া সেই অতিথিশালায় দ্বিতালায় এক প্রকোষ্ঠে কোনমতে রাত্রি যাপন করিলাম। পর দিবস সূর্য্যোদয় হইলে প্রাতঃকালে একটী পাণ্ডাকে সঙ্গে করিয়া আমরা তিনজনে স্নান করিতে গেলাম। এলাহাবাদে যেমন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এই নদীত্রয় মিলিত হইয়া "প্রয়াগ" নাম ধারণ করিয়াছে, সেইরূপ এখানে মন্দাকিনী, অলকানন্দী, ভাগিরথী এই তিন নদীর একত্র সঙ্গম হওয়াতে "দেবপ্রয়াগ" নাম ধারণ করিয়াছে এই তিন নদীর সঙ্গম স্থলের দৃশ্য অতি আশ্চর্য্য ও মনোহর লেখনীর সাধ্য নাই যে তাহা ভাষায় সবিশেষ বর্ণনা করে। সেই অতুলনীয় শোভা দেখিলে মোহিত হইতে হয়। একটী প্রকাণ্ড শিলার উপরে তিন দিক হইতে তিন নদী আসিয়া এইখানে আছড়াইয়া পড়িয়া আবার বিদ্যুৎ বেগে ছুটিয়া যাইতেছে কতই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। স্ফটীকবর্ণ মন্দাকিনীর জল তাহাতে ঈষৎ নীলাভ অলকানন্দা ও ভাগীরথির ঘোলা জল মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব রঙ্গের বিকাশ হইয়াছে। এই সঙ্গম স্থলে স্নান করিতে হয়। নদীর জল বরফের মত ঠাণ্ডা, আমরা তিন জনে একে একে স্নান করিয়া সিঁড়ি

ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া পুনরায় এই সঙ্গম স্থলের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলাম। তারপর পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলাম এ "দেবলোক" সন্দেহ নাই।

তারপর আমরা পাক করিয়া আহারাদি শেষ করিয়া বেলা প্রায় একটার সময় এইস্থান পরিত্যাগ করিলাম। যাইতে যাইতে দেখিলাম একটী খর্ব্বাকৃতি পাহাড়ী লোক একটা মানুষকে একটী বেতের ছোট আসনে ইজি চেয়ারের মত হেলান দিয়া বসাইয়া একটী দড়ি আপনার পিঠে বাঁধিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতেছে। তাহার হাতে একটী লাঠি আছে, বেশী পরিশ্রান্ত বোধ হইলে ঐ লাঠির উপর হাত রাখিয়া ইহারা বিশ্রাম করিয়া থাকে। যাহারা বদরী নারায়ণ নিজে হাঁটিয়া যাইতে অসমর্থ তাহারা হরিদ্বার হইতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া এইরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকে। হরিদ্বার হইতে বদরী-নারায়ণ এইরূপে যাইলে প্রায় ১৫০৲ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আর একপ্রকার ঝাপান আছে। ইহার আগে পাছে ৪ জন করিয়া পাহাড়ী লোক পাল্কীর মতন আরোহিকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়। অনেক ধনশালী ব্যক্তি এই ঝাপানে আরোহণ করিয়া পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রায়

৭০০।৮০০৲ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এইখান হইতেই একটু শীত আরম্ভ হইল এবং চতুর্দ্দিকে সাদা সাদা অল্প বরফের স্তূপসকল দেখা যাইতে লাগিল।

এইরূপে আমরা ক্রমাগত চলিতে চলিতে বিত্থাকুই, সীতাকুই, রামপুর জলের ঝরণা অতিক্রম করিয়া হুগোমী চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই হুগোমী হইতে রওনা হইয়া দুই ধারে সারি সারি আমবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম, জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্রে পিপাসায় বুক শুকাইয়া আসিল। নিকটে জল পাইলাম না, অবশেষে ছোট ছোট কাঁচা আম খাইতে লাগিলাম, ইহাতে অনেকটা পিপাসা শান্তি হইল। পরে এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাকালে ভলকেদার মহাদেব চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

চটীতে যাত্রীর ভয়ানক ভিড়, সুতরাং আমরা তিনজনে পরামর্শ করিয়া নিকটে একটী গোলাকার ইষ্টক এবং সিমেণ্ট দ্বারা মণ্ডিত বটবৃক্ষ তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। স্থানটী অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন, ইহার চারি দিকে অসংখ্য যাত্রী অনাবৃত স্থানে যে যাহার কম্বল বিছাইয়া মনের সুখে নাসিকাধ্বনি করতঃ নিদ্রা যাইতেছে। পার্শ্বেই কিছু নিম্নে গঙ্গাদেবী সুমধুর কুলু কুলু ধ্বনি করিয়া প্রবাহিতা

হইয়াছে এবং অধিক রাস্তা হাঁটিয়াও পরিশ্রান্ত হওয়া গিয়াছে এখন পাক হইবে কি? তখন রমেশবাবু বলিলেন—না খাইয়া এপথে হাঁটা বড় দুষ্কর, সকলে মিলিয়া জোগাড় করিয়া লইলে আর কতক্ষণই বা লাগিবে? মনে মনে ভাবিলাম আমি ত কপর্দ্দক শূন্য, আমার ইচ্ছায় কি হইবে। আমি গঙ্গায় যাইয়া একঘড়া গঙ্গাজল আনিলাম, কেহ বাঁজার করিল, কেহ উনান ধরাইল, আমি পাক করিতে লাগিলাম। এইরূপে সকলে মিলিয়া মিশিয়া অতি শীঘ্রই খিচুরী অন্নপাক করিয়া তৃপ্তির সহিত আমরা তিনজনে আহার করিলাম এবং পূর্ব্বোক্ত বটবৃক্ষের তলে আমরা সকলেই একত্র পাশাপাশি হইয়া শুইয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে কোথা হইতে একদল "রামায়েৎ" সন্ন্যাসী আসিয়া এখানে হাজির হইলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া বটবৃক্ষের অন্য পার্শ্বে আড্ডা করিলেন। তাঁহারা সমস্বরে এমন মধুরকণ্ঠে রাম নাম স্তব করিতে লাগিলেন, যেন হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল? প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভক্তিভাবের উদয় হইল—এইসব সাধু সজ্জন মহাত্মাদের সমাগমেই বোধ হয় তীর্থস্থান অতি মধুর এবং পবিত্র হইয়াছে, আমার বিষম শীত বোধ হইতে লাগিল। কাঁথাখানিতে তখন আর শীত মানিতেছে না

এখনও শীতের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হই নাই, এখনই এত শীত, জানিনা ইহার পরে আরও কত শীত হইবে, এইরূপ মনে করিয়া সঙ্গীদের কম্বলের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া আমরা গঙ্গাজলে স্নানাদি করিয়া নিকটস্থ মন্দিরে ভলকার মহাদেব দর্শন করিতে গমন করিলাম। মহাদেব বেলপাতায় বড় তুষ্ট হইয়া থাকেন সেজন্য পথিমধ্যে অনেক ভাল বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, আমরা তিনজনে ভক্তিভরে পুষ্প এবং বিল্বপত্র দ্বারা মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়া তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি, এমন সময়ে দেখি ঐ রামায়েৎ সন্ন্যাসীর দল তাহাদের মধ্যভাগে সুন্দর একটী রামলালা অর্থাৎ ("রামের মূর্ত্তি") স্থাপন করিয়া তাহারা ঐ বিগ্রহটীর চতুর্দ্দিকে বসিয়া সমস্বরে স্তব করিতেছে। তাহাদের ক্ষুদ্র পুটুলী হইতে কিস্‌মিস্ সন্দেশ, ইত্যাদি ভাল ভাল দ্রব্যাদি বাহির করিয়া রাম-লালাকে ভোগ দিল, সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটীর চক্ষু যেন সত্য সত্যই জ্বলিতেছে, এমন সুন্দর মূর্ত্তি জীবনে কখনও দর্শন করি নাই। আমরা তিনজনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ঐ মধুর স্তব শুনিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিলাম। পথে যাইতে যাইতে আরও অনেক যাত্রীরদল আমাদের সঙ্গী হইল তাহাদের প্রাণে কি

করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছে, আর একদল দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে যাইতেছে যখন উভয় দল একত্রিত হয়, তখন 'জয় বদরী বিশাল লালাকি জয়!' 'জয় কেদার নাথজীকি জয়' ইত্যাদি শব্দে যেনআকাশ মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, সে আনন্দের তুলনা নাই। সকলেরি মন প্রাণে কি অপূর্ব্ব অনন্ত ভক্তি ভাব তড়িৎবেগে প্রবাহিত হয় তাহা এই পথে গমন না করিলে জানিতে পারা যায় না।

আমরা তিনজনে অতি দ্রুত গতিতে কোনদিন ৪।৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে লাগিলাম, এই দুর্গম পথে—বিদেশে এত অধিক হাঁটা সঙ্গত নয় মনে করিয়া শেষে বেলায় ২।৩ ক্রোশ করিয়া হাঁটিবার ব্যবস্থা হইল। কেননা, সহসা পীড়িত হইয়া পড়িলে ঘোরসঙ্কটে পড়িতে হইবে।

এইরূপে পদব্রজে চলিতে চলিতে পুরাতন শ্রীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে কমলেশ্বর নামক মহাদেব আছেন। তারপর এখান হইতে এক মাইল পরে নূতন শ্রীনগরে গেলাম, স্থানটী কতকটা সহরের মত, সারি সারি অসংখ্য দোকান পশারি দেখিলাম। এখানে এক প্রকাণ্ড অতিথিশালায় গমন করিয়া স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক পাক করতঃ আহারান্তে খানিক বিশ্রাম করিয়া সুখ উপভোগ করিলাম। পরে অপরাহ্নে পুনরায় যাত্রা করিয়া,

সুকরতা চটী, ভট্টাসেরা চটী, থাকরা, পাঁচ ভাইয়ের ধার, গুলাবরাম চটী অতিক্রম করিয়া, পরদিবস বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে রুদ্রপ্রয়াগে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে মন্দাকিনী এবং অলখনন্দার সঙ্গম হওয়াতে "রুদ্রপ্রয়াগ" নামে তীর্থ হইয়াছে। আমরা এই সঙ্গম স্থানে স্নান করিলাম এবং চটীতে পাক করিয়া খাইলাম। এখানে গভর্ণমেণ্টের পোষ্টাফিস আছে সুতরাং আমার এই নিঃসম্বল অবস্থা দেখিয়া দুইজনে পরামর্শ করিয়া একখানা খামে আমার এক ভ্রাতার নিকট কিছু অর্থ সাহায্যের প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র ডাকযোগে পাঠাইবার ব্যবস্থা দিলেন, আমিও সম্মত হইয়া তাহাই করিলাম। হরিদ্বার হইতে "রুদ্রপ্রয়াগ" অনুমান ৮০ আশী মাইল দুর হইবে। এখান হইতে একটী সোজা রাস্তা বদ্রিকাশ্রম গিয়াছে, আর একটী ঘুরিয়া কেদারনাথে গিয়াছে। যাহাদের কেদারনাথ যাইবার ইচ্ছা আছে, তাহারা এই সোজা রাস্তায় বদ্রিকাশ্রম না যাইয়া মন্দাকিনীর উত্তর দিয়া কেদারনাথ যাইয়া থাকেন। সুতরাং আমরাও তিনজনে কেদারনাথ যাইবার অভিপ্রায়ে এই মন্দাকিনীর ধারে ধারে চারিদিকে প্রকৃতির অনন্ত শোভা দর্শন করিয়া ধীরে ধীরে চলিলাম। ছতোলা চটী, মঠ চটী, রামপুর চটী, অগস্ত্যমুনি চটী, ছোট নারায়ণ, তারপর চন্দ্রাপুরী (এখানে চন্দ্রশেখর মহাদেব আছেন)।

তারপর ভৈরব চটী, অতিক্রম করিয়া কুণ্ডচটীতে আসিয়া সন্ধ্যার সময়ে একটী দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে আমরা তিনজনে খানিকটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম। অন্য অন্য প্রকোষ্ঠে আরও অন্যান্য যাত্রী দেখিলাম। ক্রমেই যাত্রীর ভিড় বেশী হইতে লাগিল আমরা রাত্রিতে পাক না করিয়া দোকান হইতে কিছু রুটী প্রস্তুত করাইয়া আনিয়া আহার করিলাম। এখানে সস্তায় মহিষ দুগ্ধ পাওয়া যায় দেখিয়া, রমেশবাবু প্রচুর পরিমাণে দুধ কিনিয়া আনিলেন, খাইতে পারেন আর না পারেন দুধ কেনাটা তাহার অভ্যাস হইয়া পড়িল। পথে দুধ দেখিলেই তিনি কিনিয়া তাহা পান করিতেন। কোন সময়ে হজম করিতেও পারিতেন না, এজন্য তাহার উৎকট আমাশয় রোগ জন্মিয়া ছিল পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া হাত, মুখ, ধৌত করিয়া আমরা ৺ভগবান নারায়ণের নাম মনে মনে স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম।

তারপর "গুপ্ত কাশীতে" উপস্থিত হইলাম। এই "গুপ্ত কাশীর কথা অনেকে জানেন না। এখানে বিশ্বেশ্বর এবং অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ১ মাইল দূরে নালাগাব চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পথে রাশি রাশি ছোট লাল লাল সুমিষ্ট ফল দেখিয়া আমরা তিনজনে খুব খাইলাম। এই

ওখীমঠ গিয়াছে। ওখীমঠ কেদারনাথের গদী। আর যোশী মঠ বদরীনারায়ণের গদী। ছয় মাসকাল অনবরত বরফের স্তূপে মন্দির আচ্ছন্ন হইয়া থাকায় ছয়মাসকাল ওখীমঠে কেদারনাথের এবং ছয়মাস কাল যোগামঠে বদরীনারায়ণের পূজা, ভোগ এবং আরতি হইয়া থাকে। ঐ নালাগাব হইতে আমরা তিনজনে রওনা হইয়া ক্রমে ক্রমে মৌতাদেবীর মন্দির, নারায়নকুই, বোবংভগবতী দেবীর মন্দির পরে বেলা ২টার সময় শক্তির মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

শক্তির মন্দির।

এই শক্তির মন্দির উচ্চ পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত ; মন্দিরের সামনে দুইটী শালবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া একটি "দোলনা" ঝুলান রহিয়াছে। কয়েকটী পাহাড়ী বালক বালিকা দোলনার উপর চড়িয়া দোল খাইতেছে, আর তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্ত পংক্তি বাহির করিয়া খিল খিল হাসিতেছে। কোনরূপে দোলনার দড়ি ছিড়িয়া গেলে নিমেষ মধ্যে উচ্চ পর্ব্বত হইতে শত সহস্র হস্ত নিম্নে শিলাখণ্ডে পড়িলে বালক বালিকাদের অস্থি মজ্জা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে? পাহাড়ীদের কি অসমিক সাহস! একটী পাহাড়ী লোক

দোলনার সামনে করতালি দিয়া নাচিতেছে তাহাতে যেন বালক বালিকাগণের উৎসাহ ও আনন্দ যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়েছে। পাহাড়ী বালক বালিকাগণের এই দোল খাওয়া দৃশ্যটা অতি চমৎকার!

দোলনা শেষ হইলে পাহাড়ী বালক বালিকাগণ একে একে আসিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের তিন জনকে নীরিক্ষণ করিতে লাগিল। আমরা যেন তাহাদের নিকট চিড়িয়াখানা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যকর জীব বলিয়া প্রতীয়মান হইলাম। ইত্যবসরে অমূল্যবাবু তাহাদের সঙ্গে যেন এক হইয়া মিশিয়া গেলেন। বেশ মিষ্টি মিষ্টি আলাপ চলিতে লাগিল। ঐ বালকদিগের পিতা এক পাহাড়ী। বেশ বিনয় নম্রস্বরে হিন্দীভাষায় অমূল্যবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, বাবু! আপলোক্ ক্যাহাসে আ্যাতা হ্যায়? অমূল্যবাবু তখন একটু গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন "কল্‌কাতা"।

কলিকাতার বাবু দেখিয়া পাহাড়ী লোকটা যেন সত্য সত্যই গলিয়া গেল। সে অতি আদর ও যত্ন সহকারে আমাদের একটী ভাল জায়গায় আহারাদির সংস্থান করিয়া দিল। পূর্ব্বে আমরা যে স্থানে বসিয়াছিলাম তাহা অতি সঙ্কীর্ণ জঘন্য স্থান ছিল। লক্ষ লক্ষ মাছির ভন্ ভনানিতে এবং

এখন কলিকাতার বাবুদের যাহাতে কষ্ট না হয় এজন্য পাহাড়ী লোকটা তাহার ঘরের মধ্যের যাত্রীকে স্থানান্তরিত করিয়া আমাদের একটী ভাল জায়গায় থাকিবার স্থান করিয়া দিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই হিমালয়ের সুদূর প্রদেশে নির্জ্জন অরণ্য মধ্যেও তাহাদের দৃঢ় পাহাড়ী হৃদয় কলিকাতার বাবু নাম শুনিলে যেন ভয়ে ও ভক্তিতে দ্রবীভূত হইয়া যায়। আমরা আহারাদির পরে বিশ্রাম করিতেছি এমন সময়ে পাহাড়ী লোকটা আমাদের নিকটে বসিয়া নানারূপ গল্প গুজব আরম্ভ করিয়া দিল। আলাপে বোধ হইল, তাহাদের প্রাণ পাহাড়ে থাকে বলিয়া নিতান্ত নীরস নয়। এইসব লোক অতি সরল এবং ধর্ম্ম ভীরু। পাহাড়ী আধাহিন্দী ভাবে বুঝাইয়া বলিল, এখানে একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আছে। তাহাতেই পাহাড়ী বালকগণ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ভাল শিক্ষক অভাবে বালকগণ শিখিতে পারে না, বলিয়া পাহাড়ী অনেক আক্ষেপ ও দুঃখ প্রকাশ করিল, অমূল্যবাবু বলিলেন, আমরা কেদার ও বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিয়া কলিকাতা যাইয়া একখানি ইংরাজী পুস্তক পাঠাইয়া দিব বলিয়া আশ্বাস দিলেন। কারণ পাহাড়ী লোকটার ইংরাজী শিখিবার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিলাম। পরিশেষে অমূল্যবাবু ঐ পুস্তকখানি

এবং নাম ধাম পর্য্যন্ত লিখিয়া আনিয়াছিলেন। তারপর আমরা মন্দির মধ্যস্থিত জগতজননী ভগবতীদেবীকে প্রণাম করিয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম। ক্রমশঃ ফাটা চটী অতিক্রম করিয়া রামপুর নামক চটীতে গমন করিয়া রাত্রি বাস করিলাম। এখানে দেখি চতুর্দ্দিকে কলেরার ধুম লাগিয়া গিয়াছে, অসংখ্য যাত্রীর মৃত্যু হইতেছে দেখিয়া আমরা আর পাক না করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া থাকিলাম। পরদিন এই রামপুর চটী হইতে রওনা হইলাম। পর্ব্বতের দুই পার্শ্বে দেখি ভীষণ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া কত লোক মরিয়া পড়িয়া আছে। কেহ পোড়াইবার লোক নাই। দন্তগুলি বাহির করিয়া অতি বিকট মুর্ত্তিতে যাত্রীদের মহাভীতি সঞ্চার করিতেছে, এবং মানব জীবনের পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। একটী সন্ন্যাসীকে দেখিলাম আসনে বসিয়া পর্ব্বত গাত্রে হেলান দিয়া তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন, গাত্রে কম্বল এবং পাশে একটী কাঠের কমণ্ডুল্ পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হইল কেদার হইতে আসিতেছিলেন, পথে দারুণ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন। এইরূপে ভীষণ এবং উৎকট ছবি দেখিতে দেখিতে আমরা সভয়ে পরস্পর মানব জীবনের

অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমরা তিনজনে ক্রমাগত চলিয়াছি এমন সময়ে সবিস্ময়ে দেখিলাম। একজন কাণ্ডিওয়ালা একটী লোককে পিঠে করিয়া উচ্চ পর্ব্বতোপরি ধীরে ধীরে উঠিতেছে লোকটীকে যেন চিত্র পটের ছবির মত দেখাইতেছে। চারিদিকে ছোট ঘন ঘন বৃক্ষশ্রেণী যেন স্থানটীকে মনোহর উদ্যানে পরিণত করিয়াছে। সরু সরু রাস্তা গুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। পাহাড়ী লোক বানরের মত লম্ফে ঝম্পে অনায়াসে সেই উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়া গেল। এখান হইতে অন্য রাস্তা দিয়া কেদারনাথ যাওয়া যায়, কিন্তু আমরা ত্রিযুগী নারায়ণ যাইতে মনস্থ করিয়া সেই পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলাম। পথ আর ফুরায় না। প্রায় অর্দ্ধ মাইল সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া একটী পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি উঠিলাম।

ত্রিযুগী নারায়ণ।

এখানে অনেকরকম সুগন্ধে মনপ্রাণ ভরিয়া গেল, নিকটে ক্ষুদ্র মন্দিরে একটী লোক বসিয়া আছে, তাহার ভিতরে অনেক ঠাকুর দেখিলাম এবং চতুর্দ্দিকে রাশি-

রাশি নূতন কাটা কাপড়ের অসংখ্য টুক্‌রা রহিয়াছে। পাণ্ডাঠাকুর আমাদের দেখিয়া বলিল, মহাশয়! এখানে বস্ত্র দান করিতে হয়, কিন্তু সঙ্গে নূতন বস্ত্র না থাকায় সঙ্গী লোকদ্বয় গুটি কয়েক পয়সা দিয়া আরও সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আহা! কি মনোহর সুগন্ধ, কোথা হইতে গন্ধ আসিতেছে ঠিক করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম নিকটে বুঝি কোন পুষ্পোত্তান আছে। অমূল্য বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এ দেবলোক" অসংখ্য পারিজাত ফুটিয়াছে তাই এত মনোহর সুগন্ধ আসিতেছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখি কি চমৎকার দৃশ্য! অসংখ্য বৃক্ষ হইতে রাশি রাশি গোলাপ পুষ্প ও অন্যান্য সুগন্ধি ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া সুমধুর হাস্য করিতেছে—বায়ু হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে। ইহারই মনোহর সৌরভরাশি, বায়ু সঞ্চারে ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত হইতেছে। এখন বুঝিতে পারিলাম ইতিপূর্ব্বে ইহাদের ঘ্রাণে মন প্রাণ পুলোকিত হইয়াছিল।

প্রকৃতির ভাণ্ডারে স্বভাবজ অযত্ন সুলভ এমন মনোহর স্বর্গীয় উত্তান পূর্ব্বের কল্পনাও অনুভব করিতে পারি নাই, তখন আমি সঙ্গীদ্বয়কে বলিলাম, দেব-পূজার জন্য এই ফুল-গুলি তুলিয়া লই, তখন আমরা তিনজনে অসংখ্য গোলাপ অন্যান্য পুষ্পসকল চয়ন করিয়া "ত্রিযুগী নারায়ণের" মন্দির

অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে হিমালয়ের নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়া পৌছিলাম, এই স্থানে গিরিরাজ তাঁহার একমাত্র স্নেহের নয়ন পুত্তলী কুমারী গৌরীকে এই স্থানেই মহাদেবের করে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাই ত্রিযুগে নারায়ণ তাহার স্বাক্ষীস্বরূপ আজিও এখানে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এইজন্যই ইহাকে ত্রিযুগী নারায়ণ বলিয়া থাকে। ইহার কপালে একখণ্ড বহুমূল্য হীরক ঝক্‌মক্ করিতেছে, স্বর্ণ নির্ম্মিত মুকুট এবং অন্যান্য রত্নাদিতে অন্ধকার ঘর আলোকিত হইয়াছে, ভক্তমনোহর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় ধন রত্নাদির অধিষ্ঠাত্রী মাতা লক্ষ্মীদেবী তাহার পদসেবা করিতেছেন। ইহার নিকটেই একটী ধুনি জ্বলিতেছে, হর পার্ব্বতীর বিবাহের সাক্ষী অগ্নি ধুনিতে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে পাণ্ডারা বলিল, এ অগ্নি কখনও নির্ব্বাণ হয় না। আমরা সেই ধুনি হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া ভক্তিভরে মস্তকে প্রদান করিয়া কিছু সঙ্গে আনিলাম।

তারপর ব্রহ্মকুণ্ডে, সরস্বতী কুণ্ডে স্নান করিয়া পুনরায় ত্রিযুগী নারায়ণকে দর্শন এবং প্রণাম করিয়া নিকটস্থ চটীতে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। তাহার পর লুচি এবং হালুয়া কিনিয়া তদ্দ্বারা জলযোগপূর্ব্বক "সোহন প্রয়াগ" যাত্রা

করিলাম। এখন আমাদের উত্তরাই করিতে হইবে, অর্দ্ধ মাইল নীচে নামিয়া একটী লৌহ সেতু পার হইয়া পুনরায় সোজা চড়াই করিয়া সোহন প্রয়াগ অতিক্রম করিয়া "মাথাকাটা গণেশ" নামক চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে পর্ব্বত গাত্রে দেখি একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে একটী গণেশ আছে, তাহার মাথা নাই এজন্য এই চটীর নাম মাথাকাটা গণেশ হইয়াছে। এ স্থান হইতে চারি মাইল দূরে "গৌরী-কুণ্ডে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

গৌরীকুণ্ড।

রাত্রিতে সেখানে একটী দ্বিতল প্রকোষ্ঠে রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াছি, এমন সময়ে একটী পাণ্ডা আসিয়া "গৌরীকুণ্ডে" স্নান করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। এইখানে দুইটী কুণ্ড আছে, একটীর জল বরফের মত ঠাণ্ডা, আর একটী কুণ্ডের জল বেশ গরম। এইরূপ সর্ব্বদাই উক্ত কুণ্ডের জল গরম থাকে, এই হিমের দেশে এইসব কুণ্ডে স্নান করিতে বেশ আরাম, ইহার মধ্যে গন্ধকের মত একটী তীব্র গন্ধ অনুভূত হয়। পাণ্ডাঠাকুরা বলিল, এখানে স্নান করিলে

মহা কুষ্ঠ-ব্যাধি এবং চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে যত কোন উৎকট ব্যাধি হউক না কেন? সত্বর আরাম হইয়া যায়। বোধ হয় ইহার জলে উক্ত কোনরূপ গুণ থাকিতে পারে, এ আশ্চর্য্য নহে, বিজ্ঞান বলে যেসব উৎকট দুরারোগ্য মহাব্যাধির ঔষধ প্রস্তুত করিয়া, চিকিৎসকেরা রোগ আরোগ্য করিতে পারে না। এখানে প্রকৃতির স্নেহময় হস্তস্পর্শে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা দূরীভূত হয়।

পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন, গৌরীদেবী এইখানেই ঋতুস্নান করিয়াছিলেন, বলিয়া "গৌরীকুণ্ড" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, যাত্রীরা অতি ভক্তিভরে এই জলে মস্তক স্পর্শ করিয়া পরে স্নান করিতে নামে। আমি জলে স্নান করিতে নামিয়াছি, অল্প জল, জল বক্ষঃদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এমন সময়ে পাণ্ডা-ঠাকুর বলিয়া উঠিল—"গোতামার" "গোতামার" বলিতে লাগিল। আমি "গোতাম্মার" শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় তাহার অঙ্গ ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমাদের দেশে ডুব দিবার নাম এদেশে 'গোতামার' বলিয়া থাকে। এমন সময় দেখিলাম, একটী বাঙ্গালী সাধু আসিলেন তিনি গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার পবিত্র জল ক্ষুদ্র একটী পিতলের কলসীতে তাহার গলদেশে অতি

যত্নের সহিত বন্ধ আছে। এখান হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী "চীর ফটিয়া ভৈরব" যাইয়া পরে এখান হইতে ১ মাইল দূরে "ভীমসেনশীলা"। এই স্থানে স্বর্গ আরোহণ করিবার সময় দারুণ শীতে ভীমসেন দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "ভীমশীলা" হইয়াছে। তাহার পর এখান হইতে রওনা হইলাম দুই ধারে কত ঝরণা প্রপাতাদির মোহন দৃশ্য দেখিয়া এক জায়গায় বরফস্তূপ পার হইলাম আমার পদ অনাবৃত থাকায় মনে হইল সমস্ত শরীর এবং পা যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে, পা তুলিবার আর ক্ষমতা থাকিল না, যাহা হউক ভগবানের ইচ্ছায় অতি কষ্টে বরফস্তূপ পার হইয়া যেমন উঠিব এমন সময়ে মনে হইল, যেন বরফের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছি। নিকটে পর্ব্বতের উপর একটী লোকের লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে উপরে উঠিলাম নতুবা সেই দিনেই ঐ স্থানে বরফস্তূপের মধ্যে বোধ হয় জীবন্ত অবস্থাই সমাধি হইয়া যাইত।

তারপর ভীমশীলা হইতে দেড় মাইল দূর রামবাড়ী নামক চটীতে উপস্থিত হইলাম। এইখান হইতে উচ্চ পর্ব্বতোপরি কেদারনাথ যাইতে হয়। রাস্তা অতি সংকীর্ণ এবং দুর্গম। রামবাড়ীতে রাত্রি যাপন করিয়া অতি প্রত্যূষে শ্রীদুর্গা বলিয়া কেদারনাথ যাত্রা করিলাম। এখান হইতে ঘুরিয়া ২ মাইল

উপরে উঠিলে "দেবদর্শনী" নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে আরও হিন্দুস্থানী যাত্রী আছে, এখানে একটী গণেশ আছে। এস্থান হইতে ১ মাইল দূরে কেদারনাথ মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হইল, সকলেই হর্ষভরে 'জয় কেদারনাথকী জয়" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার প্রতিধ্বনি পর্ব্বতের গাত্রে গাত্রে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে কি আনন্দ, আর ভক্তিভাব তাহা বুঝি ভাবিয়া প্রকাশের সাধ্য নাই। একটী ভক্তিমতী হিন্দুস্থানী প্রৌঢ়া বয়স্কা স্ত্রীলোক শিলাখণ্ডোপরি পুনঃ পুনঃ কপাল আঘাত করিতে লাগিল [illegible]এবং আবেগভরে অশ্রুরাশি দুই গণ্ডদেশ দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল, সে দৃশ্য দেখিলে অতি পাষাণ হৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হয়। আমরা সকলেই কেদানাথের উদ্দেশ্যে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলাম এবং অনেকে বার বার ভূমিতল চুম্বন করিতে লাগিল। এইরূপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একটি ক্ষুদ্র লৌহসেতু পার হইয়া আমরা সদলে বাবা কেদারনাথে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

কেদারনাথ।

এখন কুয়াসায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন, অল্প অল্প ঘর-দ্বার দেখা যাইতেছে আবার পুনরায় কুয়াসায় ঢাকিয়া যাইতেছে। আমরা পাণ্ডার একটী দোতালা ঘরে জ্যেষ্ঠ মাসেও শীতের ভয়ে জানালা বন্ধ করিয়া ভিতরে বসিলাম। একটি লোহার পাত্রে প্রচণ্ড অগ্নি জ্বলিতেছে এবং তাহার চারি পার্শ্বে যাত্রীরা বসিয়া আছে। ভয়ঙ্কর শীত, বেলা দ্বিপ্রহরে এই অগ্নি কুণ্ডের কাছে বসিয়াও শীতে আমরা ঠক্ ঠ[illegible]করিয়া কাঁপিতেছি। কি দারুণ শীত, ইহা অনুমানের অযোগ্য।

তারপর স্নানের কথায় আমরা কেহই স্বীকার করিলামনা একটী ক্ষুদ্র পিত্তলের ঘটী লইয়া পাণ্ডাঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া আমরা তিনজনে পঞ্চ গঙ্গার জল আনিতে গেলাম। জল বরফের মত ঠাণ্ডা, আঙ্গুল যেন কাটীয়া ফেলে; অতিকষ্টে জল একটু মাথায় দিয়া এক ঘটী জল লইয়া সত্বর কেদারনাথের মন্দির অভিমুখে চলিলাম। পাণ্ডাঠাকুর কহিলেন, কিছু ঘৃত কিনিয়া শিব লিঙ্গে মালিশ করিতে হইবে; সুতরাং কিছু ঘৃত কিনিয়া আমরা তিনজনে ভক্তিপূর্ব্বক বাবা কেদারনাথ দর্শন করিয়া তাহার পাষাণ ময় গাত্রে ঐ ঘৃত

মালিশ করিয়া পঞ্চ গঙ্গার জল ঐ লিঙ্গোপরি ঢালিয়া দিলাম। পাণ্ডাঠাকুর মন্ত্র পড়াইলেন, তারপর একে একে চতুর্দ্দিকেই অনেক দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড ষাঁড় দেখিলাম। তারপর বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া আহারাদি সমাপ্ত করিয়া যেমন মন্দিরের দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছি—অমনি মনে হইল আমার হাত পা যেন অবশ হইয়া গিয়াছে—চক্ষু এবং নাসিকাদ্বয় দারুণ হিমে যেন অসার হইয়া গিয়াছে। নড়িবার যো রহিল না, চিত্রার্পিতের মত কিছুক্ষণ থাকিলে, পাণ্ডাঠাকুর হাত ধরিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গিয়া আমাকে আগুনের নিকট ধরিলেন, তাই হাত পা আগুনে সেঁকিয়া বাঁচিলাম। কি দারুণ শীত! আমরা তিনজনে পরামর্শ করিলাম, এখানে ত্রিরাত্র থাকাত দূরের কথা, একরাত্র থাকিলেও দারুণ শীতে বরফ হইয়া যাইব। জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলা ১টার সময় এইরূপ শীত নাজানি রাত্রিতে কি হইবে? জানালা খুলিয়া দেখি কেবল কুয়াসা, দূরস্থ কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। সুতরাং আমরা এখান হইতে তিন মাইল নীচে রামবাড়া চটীতে যাইয়া থাকিব মনস্থ করিয়া আমরা তিন জনেই "জয় কেদার" বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। ভক্তিভরে কেদারনাথকে পুনঃ প্রণাম করিয়া এখান হইতে যাত্রা

করিলাম। তখন আন্দাজ বেলা ২টা হইবে। এমন সময়ে সহসা কুয়াসা কাটীয়া গেল চতুর্দ্দিকে বহুদূর দৃষ্ট হইতে লাগিল অনন্ত সৌন্দর্য্যের শোভারাশি চক্ষের সামনে খুলিয়া গেল চোখের ধাঁধাঁ এইবার মিটিল। এতদিনের পরিশ্রমের ফল অদ্য সার্থক হইল। যোগেশ্বর মহাদেবের হিমগিরি-রজত-কাঞ্চন সদৃশ বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া গেল।

পাণ্ডাঠাকুর কহিলেন আপনাদের বড় সৌভাগ্য তাই এই দৃশ্য দেখিতে পাইলেন, প্রায়ই কুয়াসায় আচ্ছন্ন থাকায় অনেক যাত্রীর ভাগ্যে এই শোভা দর্শন হয় না। আপনারা অল্পক্ষণ থাকিয়াই দর্শন পাইলেন, আপনারা ধন্য! বাস্তবিক জীবনে এমন শোভা কখনও দেখি নাই, আর দেখিব এমন মনে হয় না এ শোভার যে তুলনা নাই; মহারাজ যুধিষ্ঠির এই পথ দিয়াই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সেই উন্নত বরফ মণ্ডিত অসংখ্য পর্ব্বতরাশির শৃঙ্গোপরি সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে, সুনীল আকাশ ভেদ করিয়া অভ্রভেদী হিমগিরি কোন অজানা দেশে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা মানবের জানা অসম্ভব। যেন সাক্ষাৎ মহাদেব ধবলাকার বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করতঃ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া

মহাযোগে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। দেখিলে জন্ম এবং চক্ষুর সার্থক হয়, আমরা পুনঃ পুনঃ ভক্তিভরে ঐ স্থানে প্রণাম করিয়া নামিতে লাগিলাম। একটু পরে ভয়ঙ্কর মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতে লাগিল। নবঘন ক্রোড়ে নয়ন ধাঁধিয়া চিকিমিকি বিজলী ছুটিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের কণাসকল উপর হইতে সজোরে বর্ষণ হইয়া ছাতাভেদ করিয়া যেন গাত্রে বিঁধিতে লাগিল এইরূপ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ঐ দারুণ সঙ্কটপূর্ণ সিঁড়ি সকল অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বে রামবাড়া চটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখানেও ভয়ানক শীত দুই ধারে বরফের পর্ব্বত রহিয়াছে, রাত্রিকালে চন্দ্রোদয়ে যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে আসিয়াছি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এখানে পাক করিয়া খাইয়া বিশ্রাম করিতেছি, মধ্যে একটী প্রকাণ্ড কুণ্ডে অগ্নি জ্বলিতেছে। আমরা তিন জনে চতুপার্শ্বে রহিয়াছি অন্যান্য যাত্রীরাও রহিয়াছে। পাহাড়ী দোকানদার একটী প্রকাণ্ড কলিকায় তামাকু খাইয়া এমন ভাবে দম্ ছাড়িতে লাগিল যেন বোধ হইল এঞ্জিন হইতে ধূম উদ্গীরণ হইতেছে। একটু পরেই আমরা তিন জনে কম্বল পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। শীত যেন পিঠ ফুড়িয়া হাড় ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল সুতরাং আমরা তিনজনে উঠিয়া পুনরায় আগুনের নিকট ঘেঁসিয়া

বসিলাম। পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলাম, এতনিম্নে আসিয়াছি তাহাতেই এত শীত, বোধ হয় কেদারনাথে থাকিলে না জানি কি দশা হইত, বোধ হয় বরফের সঙ্গে মিশিয়া যাইতাম। যাহা হউক দারুণ শীতে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, সর্ব্ব শরীর থরহরি কম্পিত হইতে লাগিল। এমন ভয়ানক শীতের রাজ্যেও মানুষে কেমন করিয়া থাকে, মনে মনে কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। চারিদিকে বরফ স্তূপ সকল গলিয়া গলিয়া প্রকাণ্ড নদীর আকার ধারণ করিয়া সবেগে প্রবাহিত হইতেছে। নীরব নিস্তব্ধ রজনীতে এইরূপে আমাদের মত কত যাত্রী অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া আছে, তবু শীত কমিতেছে না; অনিদ্রায় এইরূপে বসিয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন অতি প্রত্যুষে হাত মুখ ধুইয়া এখান হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী 'দুর্গা চটী' অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখানে অবরোহণ (উত্তরাই) করিতে হয় অর্থাৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীচে নামিতে হয়। দুর্গাচটীর পর ছয় মাইল দূরে 'পোথীবাসা চটী' আছে, এখান হইতে তিন মাইল দূরে 'চোপতা নামক চটী'। এখান হইতে একটী রাস্তা তুঙ্গনাথ গিয়াছে।

তুঙ্গনাথ।

তুঙ্গনাথ কৈলাস পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত সুতরাং উপরে উঠা কঠিন। ইহার উপরে উঠিতে গেলে তিন মাইল চড়াই করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হয়। উপরে উঠিয়া পুনরায় অন্য পথে দুই মাইল উতরাই করিয়া তবে নীচে নামিতে হয়। এজন্য অনেক যাত্রী কৈলাস পর্ব্বতে না উঠিয়া অন্যপথে বদরীনারায়ণ চলিয়া যায় এই 'তুঙ্গনাথের' এক পাণ্ডা অনেকদূর হইতে আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল। পাণ্ডাঠাকুর 'তুঙ্গনাথে' যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেও এই বিঘ্ন সঙ্কুল পথে, উপরে উঠিতে আমরা প্রথমে সম্মত হইলাম না। সিঁড়ি তত ভাল নয়, আবার কোন কোন স্থানে ডাল, লতাপাতা ইত্যাদি ধরিয়া ধরিয়া উপরে উঠিতে হয়। কোনরূপে একটু পদস্খলন হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী সুতরাং জানিয়া শুনিয়া এরূপ সঙ্কটস্থলে কে যায়? ইতিমধ্যে অমূল্য বাবু সাহস করিয়া বলিয়া উঠিলেন যদি আসিয়াছি তবে উপরে উঠিবই, এতে প্রাণ থাকে আর যায়। এই বলিয়া তিনি 'তুঙ্গনাথের' সিঁড়ি ধরিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলেন, আমি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। রমেশবাবুর ততটা ইচ্ছা না থাকিলেও আমাদের

উঠিলাম দেখিয়া অগত্যা তিনিও লাঠি ভর দিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিতে লাগিলেন। কেননা পর্ব্বতে চড়াই করিবার সময় তাহার মুখমণ্ডল অমাবস্তার রাত্রির অন্ধকারের স্থায় কালিমা বর্ণ ধারণ করিত আর উত্তরাই অর্থাৎ নীচে নামিবার সময় পূর্ণচন্দ্রের স্থায় তাহার মুখে হাসি দেখা যাইত। তিনি অতি সদাশয় এবং সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, আমি যখন প্রথম চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠীয়াছিলাম, তখন মনে হইয়াছিল বুঝি ইহার মতন উচ্চ ভূমি এবং প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্যাদি আর কোথাও নাই কিন্তু কি আশ্চর্য্য! হিমালয়ের এই কৈলাস শিখরে আরোহণ করিতে করিতে আমার সে ভ্রান্তি ঘুচিয়া গেল। এমন দুরারোহ পর্ব্বতে জীবনে কখন উঠি নাই, একেত পর্ব্বতের কত উচ্চে আছি তাহার উপর আরও তিন মাইল ঘুরিয়া ঘুরিয়া উচ্চে উঠিতে হইবে, এ বড় সহজ কথা নয়! অন্য পর্ব্বতে চড়াই করিতে আমরা ২।৩ বারের অধিক বিশ্রাম করি নাই। কিন্তু এখানে উপরে উঠিতে অন্ততঃ ১০।১২ বার বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ রমেশ বাবুর ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস এখনও মনে পড়িতেছে, আমরাও দুইজনে হাঁফাইতেছি আর ক্রমাগতঃ উপরে উঠিতেছি। মধ্যে মধ্যে নীচের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি যে, রমেশ বাবু কত নীচে রহিয়াছেন। এইভাবে শেষে যখন পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ

শিখরে আরোহণ করিলাম, তখনকার দৃশ্য স্বপ্নেরও অগোচর।

আকাশগঙ্গা পর্ব্বতের উপর হইতে ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছে, অনন্ত নীলিমা যেন পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ঘটাকাশ বুঝি মহাকাশে আসিয়া মিলিল, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা সংযোগের এমন স্থান বুঝি কোথাও নাই, তাই যোগেশ্বর মহাদেব এই কৈলাস পর্ব্বতে বসিয়া যোগ-সাধনা করিয়া থাকেন। পাণ্ডাঠাকুর কহিলেন, এই কৈলাস পর্ব্বতে হর গৌরী প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছেন। কলিকালে ইহারা সাধারণ লোক চক্ষুর অগোচর হইয়া আছেন, তবে সাধনা প্রভাবে কেহবা সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। এইরূপ অনেক কথাই বলিলেন, আমরা তিনজন একটী বৃহৎ শিলার উপরে উপবিষ্ট হইয়া অবাক্ হইয়া প্রকৃতির মোহিনী দৃশ্য সকল দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে বুঝিবা বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া গিয়াছিল তাই পাণ্ডাঠাকুরের বারংবার চীৎকারে আমাদের চৈতন্যের উদয় হইল। তারপর আমরা তিনজনেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কত মেঘমালা সকল কুয়াসার মতন আমাদের গাত্রের উপর দিয়াই চলিয়া গেল। পরিশেষে পর্ব্বতোপরি একটী ক্ষুদ্র কক্ষে গিয়া আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। তারপর আকাশ গঙ্গায় স্নান করিয়া একটী

মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম মন্দিরের মধ্যে রজতময় শিবলিঙ্গ এবং সুবর্ণ নির্ম্মিত গৌরী রহিয়াছেন, চারি পার্শ্বে অন্যান্য ঠাকুর দেবতাও আছেন। ব্যাসদেব এবং মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তিও এই স্থানে দেখিতে পাইলাম। পাণ্ডাঠাকুরও আমাদের হস্তে সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্র দিয়া "ধ্যেয়ঃ নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং" ইত্যাদি মন্ত্রে মহাদেবের ধ্যান করাইয়া পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইলেন, পরে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এখানে দুই একটী দোকানও রহিয়াছে, পার্ব্বতীয় ছাগলের পৃষ্ঠদেশে আটা, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি অনেক কষ্টে আনীত হইয়া থাকে, তাই জিনিষ-গুলি অতি মহার্ঘ। আমরা লুচি এবং তরকারী দোকানীকে দিয়া প্রস্তুত করাইয়া তিনজনে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া পর্ব্বতের অন্য রাস্তা দিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। এখনও প্রায় দুই মাইল নিম্নে যাইতে হইবে, এবার রমেশ বাবুর মুখে আর হাসি ধরে না, কেননা নীচে নামিতে তিনি আমাদের অপেক্ষা বিশেষ পটু, তাই তিনি যষ্টি হস্তে দীর্ঘপদে অতি দ্রুতভাবে আমাদের নিকট হইতে নিমিষের মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন। অমূল্যবাবু ও আমি কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। আমরা

আছেন, এমন সময়ে সহসা আমার পায়ের নীচের পাথরখানা আল্গাভাবে থাকায় হঠাৎ সরিয়া গেল, আমি ঘুরিয়া নীচে পড়িয়া গেলাম, যষ্টি দ্বারাও আমার দেহ ঠিকভাবে রাখিতে পারিলাম না। আমি চার পাঁচ হাত নিম্নে একটী বৃহৎ শিলাখণ্ডে আট্‌কাইয়া ছিলাম, আর একটু সরিলেই অগাধ নিম্নে পতিত হইয়া প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে মস্তকাদি শত খণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত! বুঝি এবার মৃত্যুটী আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল না, তাই ভগবানের ইচ্ছায় এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। আমি মূর্চ্ছিত হইবার পর একটু সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখি হাঁটুতে বিষম লাগিয়াছে। চামরা কতকটা ছিড়িয়া রক্ত পড়িতেছে। ইহার একটু পরেই অমূল্যবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে আমার অবস্থা সবিশেষ বলিলাম. তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন কাপাড়ের একাংশ ছিড়িয়া তদ্দারা পটী বাঁধিয়া অতি ধীরে ধীরে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অতিকষ্টে নীচে "ভেমুরিয়া" নামক চটীতে আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অমূল্যবাবু বলিলেন, রমেশ বাবু অতিদূরে গিয়াছেন তাহাকে ধরা চাই, নতুবা এই চটীতেই থাকিতাম আমিও দ্বিরুক্তি না করিয়া সঙ্গী হারাইবার ভয়ে বলিলাম চলুন, আমার বিশেষ লাগে নাই তবে প্রথমটা চলিতে

চলিতে লাগিলাম। ক্রমে ৩ মাইল দূরে "পাগর হালা" চটী পার হইয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলাম না, তাহার পর আরও চারি মাইল অতিক্রম করিয়া তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। সে রাত্রিতে কিছু আটা কিনিয়া হাততালি দিয়া পুরু পুরু রুটী তৈয়ার করিয়া, আহারান্তে শুইয়া পড়িলাম। পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় সেখান হইতে যাত্রা করিয়া "সিংঘেনা গোপেশ্বর" অতিক্রম করিয়া "লালসাংত্র" আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে সুন্দর একটী লৌহ সেতু পার হইয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল পর্ব্বত উপরে আরোহণ করিয়া "মঠ" চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে আধ মাইল দূরে "ছাঁকা" চটীতে যাইয়া নিকটস্থ ঝরণার জলে স্নান করিয়া পাক আরম্ভ করিয়া দিলাম। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া এখান হইতে পৌনে দুই মাইল "বাবলা" চটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে "বিরহ গঙ্গা" এবং অলখনন্দার সঙ্গম হইয়াছে। তারপর "সিয়া" চটী, "হাট" চটী, অতিক্রম করিয়া "পীপল" চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এখানে একটী প্রকাণ্ড বাজার দেখিলাম। এখানে উৎকৃষ্ট চমরু গরুর নানারূপ অসংখ্য চামর দোকানিরা ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। এখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে "গরুড় গঙ্গা" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানেও একটী

বাজার দেখিলাম, অসংখ্য যাত্রী গরুড় গঙ্গায় স্নান করিতেছে। জল অতি অল্প হইলেও তাহার স্রোত তীব্র বেগে চলিতেছে। জল বেশ পরিষ্কার, আমরা তিনজনে জলে নামিয়া স্নান করিলাম। এমন সময়ে দেখি অনেকে "গরুড় গঙ্গা" হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের নুড়ী সংগ্রহ করিতেছে। ইহা গৃহে রাখিলে সর্পভয় থাকে না। আমরাও কিছু সংগ্রহ করিয়া পরিশেষে "মংগনা" চটী অতিক্রম করিয়া "পাতাল গঙ্গায়" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে শত হস্ত নিম্নে খরবেগে পাতাল গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। সেদৃশ্য অতি আশ্চর্য্য! অপরাহ্নে "গুলার" চটী অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় "কুমার" চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে দেখি একটী দোকানে একটী পাহাড়ী, যাত্রীদিগকে অনেক পার্ব্বত্য ঔষধ শিকড় ইত্যাদি বিক্রয় করিতেছে। একটী উৎকৃষ্ট জিনিষ বিশুদ্ধ শিলাজতু ধাতু, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, সাধু সকলেরি নিকট বিক্রয় করিতেছে, শুনিলাম ইহা অতি পুষ্টিকর বস্তু। ইহা দেখিতে কাল এবং কতকটা চিটা গুড়ের মত, যোশী মঠেও অনেক দোকানদার এই "শিলাজতু" ধাতু বিক্রয় করিয়া থাকে। হিমালয়ে বিশাল অরণ্য মধ্যে পর্ব্বত গাত্রে কত মৃতসঞ্জীবনী তুল্য ঔষধ রহিয়াছে কে খুঁজিয়া বাহির

রোগের ঔষধ অতি অল্প মূল্যেই বিক্রয় করিয়া থাকে। এই "কুমার" চটীতে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে "খতোলা" চটী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই পর্ব্বতের রাস্তা সকল তত ভাল নয়, সুতীক্ষ্ণ কঙ্কর জালে পরিপূর্ণ, আমার পায়ে জুতা ছিল না সুতরাং কঙ্করের আঘাতে আমার পদদ্বয় হইতে রক্ত ধারা ছুটিতে লাগিল, পা ফুলিয়া গেল, অতিকষ্টে চলিতে লাগিলাম। ক্রমে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হইল, তবুও চলিতে লাগিলাম। সঙ্গীরা অগত্যা আমার দশা দেখিয়া আস্তে আস্তে হাঁটীতে লাগিলেন। নিকটেই একটী চটী হইতে দশ আনা দিয়া এক জোড়া জুতা কিনিয়া দিলেন, ইহার নীচে পাট দ্বারা নির্ম্মিত শক্ত দড়ীর মত, উপরে কাপড় দ্বারা মণ্ডিত, বেশ মোলায়েম, পার্ব্বত্য পথে যাইতে হইলে এই জুতা পায়ে দিয়া যাইতে বেশ সুবিধা। ইহাতে পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইবার আশঙ্কা থাকে না। তারপর এই "খতোলা" চটী হইতে চারি মাইল দূরে "সোধারা" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে দুইটী পথ—একটী "বিষ্ণু প্রয়াগে" সোজা রাস্তা গিয়াছে অন্যটী ঘুরিয়া "যোশীমঠ" হইয়া বদরিকাশ্রম গিয়াছে। এখান হইতে এক মাইল দূরে যোশীমঠ গিয়া উপস্থিত হইলাম।

——

যোশীমঠ।

এই সুদূর পার্ব্বত্য পথে এখানেও গবর্ণমেণ্টের পোষ্টাফিস এবং টেলীগ্রাম আফিস রহিয়াছে। তারপর একটী অদ্বৈত আশ্রমের নিকটের চটীতে যাইয়া আমরা তিনজনে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই 'যোশীমঠ' মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত। এখানে অদ্বৈত আশ্রমে কয়েকটী সন্ন্যাসী দেখিলাম। আমরা যাইয়াই একটী কক্ষে ঝরণার জলে স্নান করিয়া নৃসিংহদেব, দুর্গামাতার মন্দির প্রভৃতি দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। দারুণ বরফে মন্দির আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে ঐ পথে লোকজন আর যাইতে পারে না; তাই ছয়মাস কাল এই "যোশীমঠে" বদরী-নারায়ণের ভোগ ও আরতি হইয়া থাকে। আর কেদার নাথের "ওখীমঠে" ছয়মাস কাল ভোগ ও আরতি হইয়া থাকে। তারপর এখানে আহারান্তে কিছু কাল বিশ্রাম করিবার পর আমরা 'বিষ্ণু প্রয়াগ' অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এখান হইতে "বিষ্ণু প্রয়াগ" এক মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে নীচে প্রায় অর্দ্ধমাইল উতরাই (অবরোহণ) করিতে হইবে। সোজা নামা বড়ই কষ্টকর। আমরা অতিকষ্টে নামিতেছি, প্রকৃতির সুরম্য নির্জ্জন কানন দেখিয়া যেন পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিলাম।

তারপর ক্রমেই সোজা নামিতে লাগিলাম, পথ আর ফুরায় না। আবার দেখি, নিম্নে বহু দূরে ছবির মত একটী ক্ষুদ্র মন্দির দেখা যাইতেছে, উহাই "বিষ্ণু-প্রয়াগ" নামে অভিহিত।

বিষ্ণু প্রয়াগ।

এখানে বিষ্ণু গঙ্গা গম্ভীর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিতেছে, গঙ্গার এমন ভীষণ তরঙ্গ আর কোথাও দেখি নাই। কি ভয়ানক বেগে চলিয়াছে, তাহার তরঙ্গরাশি নদীর মধ্যভাগে বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে আঘাতিত হইয়া ইতস্ততঃ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। সেদৃশ্য কি রমণীয় ও মনোহর, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে অন্যকে বুঝান অসম্ভব। আমরা তিনজনে দুই শতাধিক হস্ত নিম্নে নামিয়া গঙ্গাবারি মস্তকে প্রদান করিয়া কিছু উপরে একটী ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এখানে বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি দর্শন এবং প্রণাম করিয়া 'বুলদোড়.' ৮টী অতিক্রম করিয়া 'ঘাটচটী' আসিয়া পৌঁছিলাম। এইপথ বড়ই বিঘ্ন সঙ্কুল, শুনিলাম অনেক যাত্রী এই 'ঘাটচটী' হইতে বদরীকাশ্রম যাইতে প্রাণ হারাইয়াছে। পর্ব্বতোপরি প্রকাণ্ড শিলাসকল মধ্যে মধ্যে গড়াইয়া নিম্নে পতিত হয়, তাহার আঘাতে অনেকের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। আমরা

উহা শুনিয়া অতি সশঙ্কচিত্তে এই ঘাটচটী অতিক্রম করিতে লাগিলাম। ইহার পথ অতীব ভীষণ, একটু সরিলেই আর রক্ষা নাই।

দুই ধারে অভ্রভেদী যেন অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী চলিয়াছে, পার্শ্বে সংকীর্ণ ঢালু রাস্তা দিয়া আমরা তিনজন ও অন্যান্য যাত্রীরা চলিয়াছি, কাহারও মুখে কথা নাই, কি করিয়া এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারা যায়, কেবল ইহাই ভাবনা। বিশেষতঃ সন্ধ্যা আসিতে না আসিতে অন্য চটীতে আশ্রয় লইতে হইবে, নতুবা হিংস্র জন্তুদের মুখে নিশ্চয় প্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে, সুতরাং খুব দ্রুত গতিকেই অগ্রসর হইতেছি, এমন সময়ে পঞ্চাশ হাত দূরে পর্ব্বত উপর হইতে একটী প্রকাণ্ড শিলা গড়াইয়া গড়াইয়া নীচুতে পড়িয়া গেল। আর একটু নিকটবর্ত্তী হইয়া ঐ প্রকাণ্ড শিলা গড়াইলে সকলেই ঐ উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিমিষের মধ্যে ভূগর্ভে অন্তর্দ্ধান হইতে হইত, কাহারও কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। বিধাতার কি মহিমা, এই ভীষণ দুর্গমপথে প্রতিপদে মৃত্যুভয় থাকিলেও তিনি ভক্তদিগকে আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষা করিয়া থাকেন। নতুবা পিপীলিকাবৎ অসংখ্য যাত্রীদল নিরাপদে কখনই বদরীকায় যাইতে পারিত না।

এখানে একটা চটীতে বাসা লইয়া আমরা তিনজনে কম্বল পাতিয়া শুইয়া বিশ্রাম করিতেছি। দিবসের পরিশ্রমে আমার একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছে, সহসা হিমালয়ের সেই নির্জ্জন কাননে সন্ধ্যার পর আরতির সুমধুর শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরাদির বাদ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, আরতির বাজনা হইতে লাগিল, দেখিলাম সঙ্গীদ্বয় নাই, তাহারা আরতি দেখিতে গিয়াছেন। আমাকে একলা ফেলিয়া দুইজনে আরতি দেখিতে যাওয়ায় মনে মনে রাগান্বিত ও দুঃখিত হইলাম। এই দূর প্রবাসে অনেক দিন একত্র থাকায় পরস্পর সুখ-দুঃখ বিপদের সাথী বন্ধুত্রয় কেহ কাহাকেও পর বলিয়া ভাবিত না, নিতান্ত আপনার বলিয়াই মনে করিত, তাই তাঁহারা বাসায় প্রত্যাগমন করিলে আমি বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিলাম। কিহে ? রমেশ বাবু! ফাঁকি দিয়ে দেবদর্শন হলোত ? নিজে কপর্দ্দিকহীন, এক রকম তাহাদেরই সাহায্যে চলিয়াছি তথাপি রূঢ়-ভাষা শ্রবণ করিয়া তাহাদের ক্রোধের সঞ্চার হইল না, বরং হাসিতে হাসিতে আরতির বর্ণনা করিয়া বলিলেন এখানে অর্জ্জুনের মূর্ত্তি আছে। বোধ হয় যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব এখানে আসিয়াছিলেন, সেজন্য ইহার নাম হইয়াছে পাণ্ডুকেশ্বর। এদিকে জঠরানল জ্বলিয়া উঠিল দেখিয়া আমি নিকটস্থ ঝরণা হইতে জল

আনিয়া পাকের আয়োজন করিয়া দিলাম এবং শেষে আহারান্তে এখানেই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে হস্ত মুখ ধৌত করিয়া নারায়ণের নাম মনে মনে স্মরণপূর্ব্বক বদরীকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম মধ্যে "রামবগড়" চটী অতিক্রম করিয়া "হনুমান" চটীতে আসিয়া স্নান করিয়া একটী মন্দির মধ্যে হনুমানজীর বৃহৎ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। তারপর আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর অপরাহ্নে এখান হইতে আমরা তিন মাইল দূরে 'কাঞ্চন' গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই কাঞ্চন গঙ্গা হইতে চারি মাইল দূরে বদরিকাশ্রম অবস্থিত।

বদরিকাশ্রম।

এ পথে যাইতে দুই তিন স্থানে বরফস্তুপ সকল পার হইয়া যাইতে হয়। কলিকাতায় গরম হইলে যেমন পয়সা দিয়া বরফ কিনিয়া খায় এখানে সেই বরফের রাশি প্রচুর পরিমাণে স্তূপাকারে পড়িয়া থাকে; এক টুকরা লইয়া মুখে দিলাম সমস্ত মুখ যেন ঠাণ্ডায় অসাড় হইয়া গেল। দুইধারে

আমরা পর্ব্বত গাত্রের ঢালু স্থান দিয়া যাইতেছি, ইহার সহস্র হস্ত নিম্নে বরফস্তূপ হইতে বরফ গলিয়া নদীর আকার ধারণ করতঃ কুলু কুলু ধ্বনি করিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, বোধ হয় এজন্যই ইহাকে "রজত-গঙ্গা" বলিয়া থাকে। এখান হইতে বদরীনারায়ণ বেশী দূর নয়। মেঘবর্ণ দুইদিকে দুইটী উন্নত পর্ব্বত দণ্ডায়মান আছে ইহার একটিকে "নর" ও অপরটীকে "নারায়ণ" পর্ব্বত বলে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে এখান হইতে ভগবান বদরী-নারায়ণের মন্দিরের গম্বুজের উপরিভাগস্থ স্বর্ণচূড়া দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। আমরা সকলে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিলাম। সকলে সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জয় "বদরীবিশাল লালাকী জয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে যে কি আনন্দ, তাহা বুঝি ভাষায় বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। তারপর একটী লৌহসেতু পার হইয়া ক্ষুদ্র বরফস্তূপ অতিক্রম করিয়া আমরা সকলে বদরীক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। একটী সৌমমূর্ত্তি পাণ্ডা আসিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে রোমাবৃত্ত কোট প্যাণ্টে আবৃত রহিয়াছে। সেই অদ্ভুত পোষাক বার বার দেখিতে লাগিলাম, বোধ হয় হিমের দেশে পশুর লোম নির্ম্মিত পোষাক শীত নিবারণের পক্ষে উৎকৃষ্ট—তাই এখানকার পাণ্ডারা এই রকম পোষাক পরিয়া থাকে।

সেই পাণ্ডার সঙ্গেই আমরা চলিলাম। পরিশেষে দ্বিতলের একটী প্রকোষ্ঠে আমরা যাইয়া কম্বল এবং কাঁথা পাতিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে বদরীনারায়ণের মন্দির সামান্য একটু দূরে অবস্থিত। ইহার দুইদিকে সারি সারি দোকান পশারি রহিয়াছে। হালুইকরের দোকানের সংখ্যাই অধিক দেখিলাম, রাত্রে পাণ্ডাঠাকুর গোপালভোগ প্রসাদ আনিয়া দিলেন, ঐ প্রসাদ ভক্ষণ করিয়াই রাত্রিযাপন করিলাম। দারুণ শীত, এ হিমের রাজ্যে ঘটীর জল পর্য্যন্ত বরফ হইয়া যায়। রাত্রে একটী প্রকাণ্ড লোহার কড়াইএ অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া আমরা সকলেই ইহার চতুর্দ্দিকে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছি, এমন সময়ে একদল বৈষ্ণব যাত্রী আসিলেন, তাহাদের মস্তকের উপরিভাগে প্রকাণ্ড টিকি এবং কণ্ঠে সুদীর্ঘ মোটা তুলসীর মালা লম্বিত রহিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গেই হরিনামের ছাপা। ইহার মধ্যে একটি পণ্ডিত লোকের সহিত আলাপ হইল, ইনি ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থই পর্য্যটন করিয়াছেন। তাহার সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। এত বড় পণ্ডিত কিন্তু তাঁহাতে অহঙ্কারের লেশ মাত্র দেখিতে পাইলাম না। এখন দেখি, লোকে দুই একটি পাশ করিয়াই বিদ্যার অহঙ্কারে

বিচিত্র! এখানে কলির অধিকার নাই, তাই এইসব স্থানে মনের শান্তিতে পরম সুখে কাটিয়া যায়।

ঐ বৈষ্ণবটীর সঙ্গে আলাপ হইল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবান ত সর্ব্বত্রই আছেন, তবে আপনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া, জীবনকে সঙ্কট মনে করিয়া এত দূরদেশে কেন আসিয়াছেন? তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, বাবা! তীর্থ অতি পবিত্র স্থান। এখানে আসিলে দেহ-মন-প্রাণ পবিত্র হইয়া ভগবানের প্রকৃত রস আস্বাদন করিতে পারে। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন বলিয়া কি পিঁপড়ে আর হাতীর সমান বল হইবে? শক্তি বিশেষ তীর্থস্থান গুলিতে তাহার বিশেষ শক্তির প্রকাশ আছে, নতুবা গৃহ, সম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় করিয়াও কেন লোক তীর্থে যায়। সংসারে যে দাবানলের মত সর্ব্বদাই অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে, তাই শান্তি পাইবার আশায় লোক এখানে আসিয়া থাকে। সংসারে যদি কিছুমাত্র সুখ-শান্তি থাকিত, তবে লোকে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও তীর্থ স্থানে আসিবে কেন? সূর্য্যের প্রকাশ যেমন মাটী হইতে জলেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি সংসার রূপ মাটী হইতে তীর্থরূপ জলে ভগবানের শক্তির রূপের মাধুর্য্যই বেশী প্রকাশ পায়। এখানে তিনি চিন্ময় বিগ্রহরূপে বিরাজ

করিতেছেন। তাই তাহার নির্ম্মল ও পবিত্র তীর্থ স্থান গুলি দর্শনে হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইয়া জীবনে পবিত্র ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন এবং সেবা করিয়া তাহার ভক্তগণের জীবন সার্থক পবিত্র ও ধন্য হইয়া থাকে। সাকার এবং নিরাকারভাবে তিনি মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্তভাবে এই জগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। যেমন কেহ যদি তাহার পিতার ফটোগ্রাফ দেখে, তবে কি ঐ ছবি অর্থাৎ পিতার মূর্ত্তি দেখিয়া সন্তানের হৃদয়ে কি ভক্তির সঞ্চার হয় না? কিন্তু এ ভক্তি সন্তানের হৃদয়ে স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, তাই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত, ব্যোম্ রূপে রসে, গন্ধে, স্পর্শে শব্দে স্থূল এবং সূক্ষ্মভাবে ভগবানের মূর্ত্তি সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার চিন্ময় সাকার বিগ্রহরূপ ভক্তের জন্য হইয়াছে। সকলে ঐ বিরাট মূর্ত্তি ধারণা করিতে পারে না বলিয়া সকলে উহার অধিকারী হয় না। ভক্তের জন্য এই সাকার মূর্ত্তি, তীর্থে ঘুরিলেই তার উদ্দীপনা হয় বলিয়া ভক্তগণ এইসব তীর্থস্থান ও সাকার মূর্ত্তি, পিতার ছবির মত দর্শন করিয়া থাকেন। ঐ মূর্ত্তি দর্শনে তাহার ভক্ত সন্তানের হৃদয়ে যে ভক্তির সঞ্চার হইবেনা সে কথার অর্থ কি? যার হয় না জগত পিতা ভগবানের মূর্ত্তি দেখিলে যে সন্তানের হৃদয়ে ভক্তি ভাবের উদয় হয় না সেকি মনুষ্য

নামের যোগ্য ? সেত নরপশু। এইরূপ কত কথাই বলিলেন, তারপর বলিলেন যাহার জীবন পবিত্র হইয়াছে যিনি ভগবানের নিরাকার এবং সাকার ভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, কেবল তাহারি কোন তীর্থে গমন করিবার আবশ্যক নাই। এরূপ পবিত্র সাধুর হৃদয়ে সমস্ত তীর্থ আসিয়া অধিষ্ঠান করেন। তাহাদ্বারা জগতে অশেষ-বিধ মঙ্গল সাধনই হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ লোক জগতে দুর্লভ। তাই শোক, তাপ দগ্ধ সংসারি লোকের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করিতে হৃদয়ে শান্তি ও পবিত্রতা আনিতে এই তীর্থ ভ্রমণই পরম ঔষধ। এইরূপ পরস্পর আলাপনে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন অতি প্রত্যুষে নিকটস্থ তুষারাবৃত পর্ব্বতে শৌচ কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলাম। নদীর জল বরফ! এত ঠাণ্ডা যেন হাত দিলে হাত কাটিয়া ফেলে। তবে এখানকার শীত কেদারনাথ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প তাহার আর সন্দেহ নাই। তাই অন্যূন তিন দিবস মাত্র বদরী নারায়ণ থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই পাণ্ডার সঙ্গে একটী বৃহৎ কুণ্ডে স্নান করিতে গমন করিলাম। বোধ হইল কুণ্ডটীর জল টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছে যেন কেহ প্রকাণ্ড একটী টবে গরম জল করিয়া রাখিয়াছে। এই শীতের রাজ্যে উষ্ণজলে স্নান করিতে কি আরাম! আর উঠিতে

ইচ্ছা করে না, ইহার কিছু নিম্নে নদী তরতর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কি ভীষণ বেগ এই কুণ্ডে স্নান করিয়া কিছু নিম্নে গমন করিয়া ঐ গঙ্গাজল মস্তকে দিয়া এখান হইতে অল্পদূর "ব্রহ্মকপালী" নামক স্থানে গমন করিলাম।

এখানে যাত্রীরা পিতা মাতার তৃপ্তার্থে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। এ মুক্তি ক্ষেত্রে কোন বিধি নিষেধ নাই সকল সময়েই লোক পিণ্ড দিবার অধিকারী। কত যাত্রী এইরূপ পিণ্ডদান করিতেছে দেখিতে পাইলাম। স্থানটি একটু বিস্তৃত এবং অন্যস্থান হইতে একটু সমতল তাই অনেক যাত্রী সারি সারি পিণ্ডদান করিতে বসিয়াছে। এইস্থান গয়া হইতেও নাকি কোটীগুণ ফলপ্রদ। আমাদের নিকট অর্থাদি কিছু না থাকিলেও অনেক কান্নাকাটী করিয়া তবে পাণ্ডাঠাকুরের দয়া আকর্ষণ করিতে পারিলাম। সেখানে একটাকা দক্ষিণা দিলে তবে ঐ "ব্রহ্মকপালীতে" পিণ্ড দিবার অধিকারী হইতে পারা যায়। পাণ্ডাঠাকুর অতি অল্প সময় মধ্যেই যব, মধু তিল তুলসী প্রভৃতি আনিয়া পিণ্ডদান করাইলেন, পরিশেষে উদ্দেশে পিতামাতায় প্রণাম করিয়া গঙ্গাগর্ভে ঐ পিণ্ড গুলি নিক্ষেপ করিলাম, প্রাণে যেন স্বর্গীয় এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। তারপর আমরা তিনজনে মহানন্দে বদরী নারায়ণ মন্দির অভিমুখে

অগ্রসর হইতে লাগিলাম। হরিদ্বার হইতে এখানে পদব্রজে আসিতে অন্ততঃ কুড়ি দিন লাগিয়াছে। বহুদিনের আশা অদ্য সফল হইতে চলিল ভাবিয়া সকলেই আনন্দে আত্মহারা সকলেরই মন প্রাণ আনন্দে ভরপুর হইয়া গেল। আশা এবং উৎসাহে সকলে সিংহদরজা পার হইয়া ভিতরে প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে ভয়ানক ভিড়, যাত্রীগণ হুড়াহুড়ী করিতেছে দেখিয়া আমরা এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে করিলাম একটু ভিড় কমিলে আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিব, কিন্তু যত বেলা হইতে লাগিল ভিড় ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একবার ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু পাণ্ডারা একগাছা প্রকাণ্ড দড়ি দ্বারা দরজা আটকাইয়া রাখিয়াছে এবং একে একে যাত্রীগণকে ভিতরে প্রবেশ করাইতেছে। তারপর যাত্রীর দল বেশী হওয়াতে পাণ্ডারা দড়া গাছিটী ছাড়িয়া দিল, তখন একদল প্রবেশ করিতে লাগিল আর একদল বাহির হইতে লাগিল। ইহারই এক ফাঁকে আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া, নীল কান্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারী নারায়ণ মূর্ত্তি দেখিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে মস্তক লুণ্ঠন করিয়া প্রণাম করিলাম। ধূপ-ধুনাদির মনোহর দিব্য সৌগন্ধে মন্দিরটী আমোদিত হইতেছে চারিদিকে অসংখ্য ঘৃতের বাতি জলিতেছে,

একটী পাণ্ডাঠাকুর পঞ্চদীপ লইয়া নারায়ণের আরতি করিতেছেন। নারায়ণের অঙ্গকান্তি অতি মনোহর, সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন একটা নীলজ্যোতি বাহির হইতেছে। এবং মুকুটে একখণ্ড হীরক ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে রাত্রি কালে সমস্ত বাতি নির্ব্বাপিত করিলেও একমাত্র হীরকের তীব্র জ্যোতিতেই সমস্ত মন্দিরটী নাকি আলোকিত হইয়া থাকে। ইহাকে বহুমূল্য বা অমূল্য রত্ন বলিলেও চলে। কোন মহাজন ইহা নারায়ণের মস্তকে মুকুটোপরি প্রদান করিয়াছেন তাহা জানিতে পারিলাম না "ভগবান বদরী নারায়ণের" চতুর্ভুজ মুর্ত্তি দেখিয়া জীবন সার্থক ও ধন্য জ্ঞান করিলাম।

পশ্চিম দেশীয় অনেক ভক্তিমতী স্ত্রীলোক নারায়ণের সামনে হাতযোড় করিয়া বসিয়াছেন, ভক্তির আবেগে তাহাদের নয়ন হইতে প্রবলবেগে অবিরল ধারায় দুইগণ্ড বহিয়া অশ্রু ধারা বর্ষণ হইতেছে সেদৃশ্য কি চমৎকার যেন মনে হয় মুর্ত্তিমতী ভক্তি দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করিলেই প্রাণে অপূর্ব্ব সাত্বিক ভাবের উদয় হয়। ভগবান বদরী নারায়ণের বামদেশে লক্ষীদেবী বিরাজিতা, যেন পদ্মহস্তে বীজনি লইয়া তাহাকে বীজন করিতেছেন পার্শ্বে ধনাধিপতি কুবেরের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। এইরূপ আরও অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তিতে মন্দির খানি শোভা

পাইতেছে। মন্দির মধ্যে অগণিত কত সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, যাত্রী, আসিতেছে যাইতেছে তাহার সংখ্যা করে কে? সকলেরি মুখে "বদরী বিশাল লালকী জয়" এই শব্দে মন্দির প্রাঙ্গণকে কাঁপাইয়া তুলিতেছে। এখানে নানারূপ ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দেওয়া হয় ভক্তেরা শেষে প্রসাদ পাইয়া থাকেন। রাত্রিতে বদরী নারায়ণের জন্য হালুয়া ভোগ হইয়া থাকে। ঐ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে কি প্রবল ভক্তিরই উচ্ছ্বাস, বহিতেছে এখানে যেন ভক্তি গঙ্গার বন্যা সবেগে বহিয়া যাইতেছে। আমরা নারায়ণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলাম এবং আরতি দর্শন পূর্ব্বক মন্দিরটিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। পরদিবস মধ্যাহ্নে পাণ্ডাঠাকুর এখানের নানারূপ মিষ্টান্ন লুচি, হালুয়া, পাঁপরভাজা, তরকারী চাটনী প্রভৃতি প্রসাদ আনিয়া দিলেন। আমরা প্রায় ২০।২৫ জন যাত্রী একত্র বসিয়া প্রসাদ পাইলাম। মন্দিরে সন্নিকটে এক মহাজন একখানা ঘরে খিচুড়ী প্রস্তুত করাইয়া দরিদ্র কাঙ্গালী, সাধু বৈষ্ণব দিগকে প্রকাণ্ড একটী তাল পাকাইয়া বিতরণ করিতেছেন। অনেক ধনী এই পুণ্যক্ষেত্রে সাধুদিগকে লুচি, মোণ্ডা মিঠাই ইত্যাদি আকণ্ঠ পুরিয়া ভোজন করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।

বদরীকাশ্রমে একটি সরকারী হাঁসপাতাল আছে দেখিলাম। সেখানকার ডাক্তারটী অতি ভদ্রলোক, তাহার সঙ্গে আলাপে যারপর নাই আনন্দ অনুভব করিলাম। এক-দিন আমরা তিনজনে অপরাহ্নে পাণ্ডাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিকটস্থ বরফ স্তূপের উপর পদব্রজে হাঁটিয়া একটা ক্ষুদ্র লৌহ সেতু পার হইলাম। এই সেতুর নিকটেই হাঁসপাতাল অবস্থিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ খাটিয়ায় শায়িত কয়েকটী রোগী দেখিলাম, তাহাদের অতি যত্নের সহিত সেবা শুশ্রূষা হইতেছে ডাক্তার মহাশয় স্বয়ং অতি যত্নের সহিত রোগীর তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় ইতি মধ্যে রমেশবাবু হঠাৎ উৎকট দারুণ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় দুইদিবস পর্য্যন্ত এই হাঁসপাতালে ছিলেন। ডাক্তার মহাশয় অতিশয় যত্নের সহিত ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিদেশে এই অসহায় যাত্রীর প্রতি করুণা প্রকাশ তাঁহার মহত্ত্বেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এ বরফের দেশে বৃক্ষ লতাদি কিছুই নাই, পাহাড়ীরা অনেক দূর হইতে কাষ্ঠের বোঝা পৃষ্ঠে করিয়া এখানে লইয়া আইসে। পার্ব্বতীয় ছাগলের পৃষ্ঠে, আটা, চিনি, ঘৃত ইত্যাদি অনেক দূর হইতে আনীত হয়। এইস্থানে গবর্ণমেণ্টের একটী দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিস এবং টেলীগ্রাম আফিস

আছে। পোষ্টাফিসে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম। আমার কনিষ্ঠ সহোদর আমার নামে ১০ দশ টাকা মনিঅর্ডারে করিয়া পাঠাইয়াছে শুনিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তারপর তিন দিবস বদরী ক্ষেত্রে থাকিয়া অপরাহ্নে পুনরায় "লালসংগ চটী" হইয়া হরিদ্বার পথে না গিয়া অন্য পথে "নন্দপ্রয়াগ' দিকে যাত্রা করিলাম। এই "লালসংগ চটী" হইতে যাইবার জন্য দুইটী পথ আছে, একটী "নন্দপ্রয়াগ" হইয়া রামনগর রেলষ্টেশনে যাইয়া ট্রেণে উঠা যায়। অন্য পথ "মঠ চটী" হইয়া হরিদ্বার রেলষ্টেশনে যাওয়া যায়। এই পথে যাইবার সময় দেখি একটী সিন্ধিয়াবাসী স্ত্রীলোক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকিনী উচ্চ পর্ব্বতে ধীরে ধীরে উঠিতেছেন। স্ত্রীলোকের ঘোড়ায় চড়া আমি এই প্রথম দেখিলাম। পর্ব্বতের ঢালু গাত্রে এমন সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, যদি কোন কারণে ঘোড়া একটু চমকিয়া উঠে তবে পদস্খলন হইয়া সেই উচ্চ স্থান হইতে প্রায় সহস্র হস্ত নিম্নে শীলাখণ্ডে পতিত হইলে অস্থি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে? স্ত্রীলোকটীর সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বঙ্কিম বাবুর আনন্দ মঠে স্ত্রীলোকের ঘোড়ায় উঠা পড়িয়া কবি কল্পনা মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম। ইতিহাস পাঠে জানা যায় রাজপুতানা দেশে

অনেক স্ত্রীলোক তরবারি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে বিপক্ষ সেনার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ফলতঃ শক্তিরূপা তেজস্বিনী রমণীগণের অসাধ্য কিছুই নাই, তাই অবলীলাক্রমে এই গিরিসঙ্কটে অশ্বপৃষ্ঠে স্ত্রীলোকটী সেই অভ্রভেদী উচ্চ পর্ব্বতে অনায়াসে উঠিয়া গেল। এইখানে তেজমল নামক বৃক্ষের একটী যষ্ঠী ক্রয় করিলাম, এই বৃক্ষের একটী বিশেষ গুণ আছে, ইহা নাকি সর্পভয় নিবারণ করে। তারপর "কর্ণ প্রয়াগ" আসিয়া স্নানাদি করিয়া কিছু জলযোগ করিলাম। এইখানে মহারাজ কর্ণের মন্দির দেখিলাম। নিকটে মহাযজ্ঞ হইতেছে; এইস্থানে মহারাজ কর্ণ নাকি ১০০৴ মন স্বর্ণ ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই স্থানে অন্ন দান করিলে মহাফল হয় এজন্য আমরা কিছু চাল গরীবদিগকে বিতরণ করিয়া, যজ্ঞ ফোঁটা পরিয়া নিকটে বটবৃক্ষ তলে একটী শিব মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তথায় মহাদেবকে দর্শন এবং প্রণাম করিয়া এইস্থান ত্যাগ করিলাম। ক্রমশঃ নানা পার্ব্বতীয় পথ অতিক্রম করিয়া "রাম নদী" পার হইয়া রামনগর আসিয়া, বাজারের নিকট একটী অতিথিশালায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বৈকালে সহরের শোভা দেখিতে বাহির হইলাম।

এখানে সমতল স্থানে বাজারটী অবস্থিত। দেখিলাম

পাহাড়ী দোকানদারেরা ক্রেতাদিগকে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে। সমস্ত জিনিষই যেন অগ্নিমূল্য। এখানে কাপড়, কয়লা, চাল, ডাল নুন, তেল সমস্তই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে বেষ্টিত বাজারটী যেন একটী সুরক্ষিত দুর্গ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। লালসংগা হইতে একটী রাস্তা হরিদ্বার এবং আর একটী রাস্তা নন্দপ্রয়াগ কর্ণপ্রয়াগ হইয়া রামনগর রেল ষ্টেশনে আসিয়া মিলিয়াছে, সুতরাং যাত্রীরা হরিদ্বার কিম্বা রামনগর, ফিরিয়া আসিলে মনে করে যেন 'নবজীবনের' সঞ্চার হইল। বাজার এবং সহরটী ঘুরিয়া শেষে রাত্রে আহারাদি করিয়া রেল ষ্টেশনে শুইয়া ঘুমাইলাম তৎপরদিন বেলা প্রায় ১০ ঘণ্টার সময় ট্রেণে উঠিয়াছি, এমন সময় মাথায় পাগড়ী বাঁধা চসমাধারী একটী নব্য যুবক ব্যাগ হস্তে আমাদের নিকটেই বেঞ্চে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি একবার আমাদিগের দিকে তীব্র দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন এবং পকেট হইতে দিয়াশলাই বার করে চুরুটে অগ্নি সংযোগ করিলেন; তাহার ধোঁয়ায় অন্ধকার হইয়া গেল। এদিকে ফেরীওয়ালারা চাই পান, সিগারেট, চাই লেমনেড, চাই মিঠাই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইতে লাগিল। বাবুটী আমাদের সঙ্গে

"ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে ঘণ্টা বাজিল। ট্রেণ বংশীধ্বনি করিয়া ছাড়িয়া দিল। আমাদের কাপড় জামা অত্যন্ত ময়লা হওয়াতে অমূল্যবাবু বলিলেন এ বীভৎস বেশে কলিকাতা যাওয়া হইবে না সুতরাং মুরাদাবাদ নামক ষ্টেশনে নামিয়া সেখানে সাবান দ্বারা কাপড় পরিষ্কার করতঃ আহারাদি করিয়া ট্রেণে উঠিলাম। যথাসময়ে ৺কাশীধামে (বেনারস) নামিলাম। একদিবস তথায় বাস করাতে প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এইরূপে ক্রমে কলিকাতা পৌঁছিলাম, রামনগর ষ্টেশন হইতে রমেশবাবু নারায়ণগঞ্জের টিকিট কিনিয়াছিলেন অমূল্যবাবু ব্যাণ্ডেল জংসনে আসিয়া নামিলেন। আমি বরাবর কলিকাতা অভিমুখে আসিয়া হাবড়া ষ্টেশনে নামিলাম। আপাততঃ আমি এইখান হইতেই পাঠকবর্গের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলাম।

পরিশিষ্ট।

হরিদ্বার হইতে **বদ্রিকাশ্রম** যাইবার পথে যে যে **চটী** অর্থাৎ বিশ্রামস্থান পড়ে, তাহাদের নাম, দূরত্ব এবং প্রধান প্রধান **তীর্থস্থানগুলি** নিম্নে দেওয়া গেল।—

দূরত্ব।	স্থান।
৬॥ মাইল	সত্যনারায়ণের মন্দির।
২। ,,	বীবীবালা।
৩ ,,	হৃষীকেশ।
১ ,,	**মোনাক্ষীরেতী।**
১॥ ,,	লছমনঝোলা।
৪ ,,	ফুলবাড়ী চটী।
৩ ,,	গূলর চটী।
২ ,,	মৌনা চটী।
৩ ,,	বিজনী চটী (আরোহণ)
৩ ,,	কুণ্ড চটী।

দূরত্ব।		স্থান।
৩	,,	মহাদেব চটী।
৪	,,	ওথলঘাট।
১	,,	খণ্ডা।
১	,,	কাঁটী।
৪	,,	ব্যাসঘাট (অবরোহণ)
৩॥	,,	ঝালরী চটী।
২॥	,,	উমরাসু চটী।
২	,,	সোড়িয়া জলের ঝরণা।
১	,,	দেবপ্রয়াগ।

মন্দাকিনী অলখনন্দা এবং ভাগীরথীর সঙ্গম, এই সঙ্গম স্থলে স্নান করিতে হয়।

৩ মাইল		বিল্বাকুই।
২	,,	সীতাকুই।
৩	,,	রামপুর জলের ঝরণা।
৩	,,	হুগোমী (আম বৃক্ষ)
২	,,	ভলকার মহাদেব।
২	,,	পুরাতন শ্রীনগর (কমলেশ্বর মহাদেব)

দূরত্ব।	স্থান।
৪ মাইল	সুকরতা চটী।
৩॥ ,,	ভট্টাসেবা চটী।
৩॥ ,,	খাকরা।
৩॥ ,,	পাঁচ ভাইয়ের ধার।
২॥ ,,	গুলাবরাম চটী।
২ ,,	রুদ্রপ্রয়াগ।

মন্দাকিনী এবং অলকনন্দার সঙ্গম। এখান হইতে বদ্রিকাশ্রম যাওয়ার সোজা রাস্তা রহিয়াছে, কিন্তু যাত্রিগণ মন্দাকিনীর ধারে ধারে কেদারনাথে যাইয়া থাকেন।

দূরত্ব।	স্থান।
৪॥ মাইল	ছতোলা চটী।
১॥ ,,	মঠ চটী।
১ ,,	রামপুর চটী।
৩॥ ,,	অগস্ত্যমুনি চটী।
॥ ,,	ছোট নারায়ণ।
৩॥ ,,	চন্দ্রাপুরী চটী (চন্দ্রশেখর মহাদেব)
৩ ,,	ভৈরী চটী।
৩ ,,	কুণ্ড চটী এখান হইতে শীত আরম্ভ।

দূরত্ব।	স্থান।
৩ মাইল	গুপ্তকাশী।
১ ,,	নালাগাব।

এখান হইতে একটী পথ কেদারনাথ আর একটী পথ ওখীমঠ গিয়াছে, ওখীমঠে কেদারনাথের গদী আছে।

দূরত্ব।	স্থান।
১॥ মাইল	মৌতাদেবীর মন্দিব।
১॥ ,,	নারায়ণকুই।
॥ ,,	বোবংগ (ভাগীরথীর মন্দির)
২ ,,	শক্তির মন্দির।
১॥ ,,	ফাটা চটী।
১ ,,	রামপুর চটী
৫ ,,	ত্রিযুগ-নারায়ণের ধুনী (সোজা উঠিতে হয়)
২ মাইল	সোহন প্রয়াগ।
১ ,,	মাথাকাটা গণেশ।
৪ ,,	গৌরীকুণ্ড।

এখানে দুইটী কুণ্ড আছে। একটীর জল গরম অন্যটীর জল শীতল।

দূরত্ব।	স্থান।
৩ মাইল	চিরফটিয়া ভৈরব।
১ ,,	ভীমসেন শিলা।
১॥ ,,	রামবাড়ী চটী।
২ ,,	দেবদেখনী।

এই স্থান হইতে কেদারনাথের মন্দির দেখা যায়।

১ মাইল	কেদারনাথের মন্দির।

এখান হইতে নালাগাব ফিরিয়া ওখী মঠে যাইতে হয়। ওখীমঠে ছয় মাস কেদারনাথের পূজা হইয়া থাকে।

২ মাইল	দুর্গা চটী (অবরোহণ)
৬ ,,	পথীবাসা চটী।
৩ ,,	চোপতা।

এখান হইতে একটী রাস্তা তুঙ্গনাথে গিয়াছে। তুঙ্গনাথ কৈলাশ শিখরে অবস্থিত, উপরে উঠা কঠিন।

২॥ মাইল	ভেমুড়িয়া (অবরোহণ)
৫ ,,	পাগরহাসা।
৪ ,,	মণ্ডল চটী।
৪ ,,	সিংঘেনা।
৩ ,,	গোপেশ্বর।

দূরত্ব।	স্থান।
২॥ মাইল	লালসাংগ (অবরোহণ)
২ ,,	মঠ চটী আরোহণ অর্দ্ধ মাইল।
॥ মাইল	ছাকা চটী।
১॥ ,,	বাবলা চটী।

এই স্থানে বিরহ গঙ্গা এবং অলখন্দার সঙ্গম হইয়াছে।

২ মাইল	সিয়া চটী।
১ ,,	হাট চটী।
২ ,,	পাপল চটী।
৫ ,,	গরুড় গঙ্গা।
৩ ,,	মংগণী চটী।
২ ,,	পাতাল গঙ্গা।
২ ,,	গুলাব চটী।
২ ,,	কুমার চটী।
২ ,,	থতোলা চটী।
৪ ,,	সোথধারা।

এই খানে দুইটী পথ আছে। একটী বিষ্ণু-প্রয়াগে সোজা রাস্তা, দ্বিতীয়টী ঘুরিয়া যোশীমঠ হইয়া বদ্রিকাশ্রমে যাওয়া যায়।

দূরত্ব।		স্থান।
১	মাইল	যোশীমঠ।
১	,,	বিষ্ণুপ্রয়াগ (অবরোহণ)
১	,,	বলদৌড়া চটী।
৪	,,	ঘাট চটী।
২	,,	পাণ্ডুকেশ্বর।
৩	,,	রামবগড় (রামবগড়)
২	,,	হনুমান চটী।
৩	,,	কাঞ্চন গঙ্গা।
৪	,,	বদরীকাশ্রম।

সম্পূর্ণ।